ড. রাগিব সারজানি

ফজর

আর করব না কাজা

অনুবাদ

আবু মুসআব ওসমান

ফজর আর করব না কাযা ॥ ড. রাগিব সারজানি

সূচিপত্র

জন্মকথা!

সান্ধ্যকালীন এক সেমিনার।

বক্তা আলোচনা করছিলেন মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে, বিরাজমান পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে। বক্তার উচ্ছ্বসিত উচ্চারণ ও আবেগি উপস্থাপন উপস্থিত শ্রোতাদেরকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল।

তিনি তার আশা ও প্রত্যাশার কথা, বিশ্বাস ও স্বপ্নের কথা শোনাচ্ছিলেন। অচিরেই আল্লাহর জমিনে তাওহিদের বাণী ও আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে; জগৎজুড়ে ইসলামি শরিয়ত ও আল্লাহর বিধান কার্যকর হবে।

অবাক বিস্ময়ে তিনি উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে নানা প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছিলেন। আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর জন্য যে মর্যাদা ও অবস্থান নির্ধারণ করেছেন, আজকের মুসলিম জাতি কেন তা হারিয়ে ফেলেছে?! কেন তারা বিধর্মীদের অনুকরণ-অনুসরণ করছে?! কেন তারা দ্বীন ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে হীনতা ও লাঞ্ছনা বরণ করে নিয়েছে?! কেন তারা জাতি ও ধর্মের শত্রুদের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে?! কেন...?! কেন...?! এবং কেন...?!

মুসলিম উম্মাহর পতন ও অধঃপতনের কারণ ও কার্যকারণ এবং উত্তরণ ও নিষ্কৃতির পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি বিশদ ও বিস্তারিত আলোচনা করলেন। প্রতিটি বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত প্রদান, বিশ্লেষণ-দৃষ্টান্তদান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ—তার পুরো আলোচনাই ছিল অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও বাগ্মিতাপূর্ণ।

সবশেষে তিনি শ্রোতাদের করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করলেন। জানিয়ে দিলেন, উম্মাহর উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের কী দায়িত্ব ও করণীয় এবং কী পরিত্যাজ্য ও বর্জনীয়।

সেমিনার সমাপ্ত হলো।

পরের দিন ভোর বেলা।

মসজিদে ফজরের নামাজ পড়তে এসে আমার উৎসুক চোখ তাকে খুঁজে ফিরছিল। মুসল্লিদের কাতারে তাকে দেখতে পেলাম না। আকস্মিক কোনো পরিস্থিতি কিংবা সাময়িক কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে হয়তো তিনি জামাতে শরিক হতে পারেননি।

দ্বিতীয় দিন ভোরেও ফজরের নামাজে তার দেখা পেলাম না। আমি উৎকণ্ঠা অনুভব করলাম। তার সংবাদ জানার জন্য অধীর হয়ে উঠলাম। না-জানি তার কোনো অকল্যাণ হয়েছে!

খোঁজ করতে করতে আমি তাকে পেয়ে গেলাম। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাই, কী হয়েছে?! কোনো সমস্যা? আল্লাহ আপনাকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখুন। গত দুই দিন ফজরের নামাজে না পেয়ে আপনাকে দেখতে এলাম।'

কিছুটা লজ্জামিশ্রিত কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন, 'ভাই, কিছু মনে করবেন না। আল্লাহ পাক আমাকে-আপনাকে-সকলকে ক্ষমা করুন! আমি অনেকটা পরিস্থিতির কাছে অসহায়! আমার অবস্থা খুবই কঠিন! সকাল সকাল কাজে যেতে হয়; ঘুমোতে হয় অনেক দেরি করে। মহান আল্লাহ তাআলা তো ক্ষমাশীল ও দয়ালু!'

তার উত্তর শুনে আমি হতবাক হয়ে গেলাম! অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তার দিকে নির্বাক তাকিয়ে রইলাম। নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, দ্বীনের একটি ফরজ বিধান পালনে যিনি এমন শিথিলতা করেন, তিনি কীভাবে পৃথিবীজুড়ে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন?!

হৃদয়জগতে টগবগে এক আলোড়ন অনুভব করলাম। বুকটা যেন কষ্টে দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে! কণ্ঠনালিতে শ্বাস আটকে যাচ্ছে! দেহজুড়ে অব্যক্ত এক যন্ত্রণা অনুভূত হচ্ছে।

আমি কিছু একটা করতে চাইলাম। কী করা যায়?

* * *

প্রিয় পাঠক,

মোটামুটি এই হলো আপনার হাতের বইটির জন্মকথা!!

দোয়া করি—আল্লাহ যেন আমাকে, তাকে, আপনাকে এবং সকল মুসলমানকে হিদায়াতের অমূল্য সম্পদ দান করেন। আল্লাহ যেন তার দ্বীনকে বিজয়ী ও মর্যাদাশীল করেন।

আল্লাহ তাআলা-ই আপন দ্বীনের তত্ত্বাবধায়ক, তিনিই বিজয় ও মর্যাদা প্রদানে ক্ষমতাবান।

—ড. রাগিব সারজানি

ফজরের নামাজ
এক ঈমানি পরীক্ষা!

হামদ ও সালাতের পর,

ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করা তো সহজ; কিন্তু ঈমান ও ইসলামি চেতনা হৃদয়ে ধারণ ও বদ্ধমূল করা অনেক অনেক কঠিন।

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾

মরুবাসীরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। তাদেরকে বলো, তোমরা ঈমান আনোনি। তবে এই বলো যে, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি। ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। [সুরা হুজুরাত : ১৪]

কখনো কখনো মুখে ঈমানের দাবি করা হলেও অন্তরের বিশ্বাস তার বিপরীত হয়ে থাকে। আবার অনেক সময় দাবি ও আচরণে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এগুলো বিশুদ্ধ ঈমানের বৈশিষ্ট্য নয়। নিষ্ঠাবান মুমিন তো তিনি-ই, যার কথা ও কাজে, আচরণে ও উচ্চারণে মিল থাকে; যিনি অন্তরে যা লালন করেন, মুখে তা-ই প্রকাশ করেন। বিপরীতে মুনাফিক ও কপট বিশ্বাসধারী যারা, বাহ্যিক আচরণ তাদেরকে হয়তো অনেক সময় নিষ্কলুষ ও পবিত্র মনে হয়; কিন্তু তাদের অন্তর পাথরের ন্যায় বা পাথরের চেয়েও কঠোর!

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মহা প্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞ। বান্দার অন্তরের গোপন চিন্তা, চোখের অবৈধ চোরা-চাহনি—কোনো কিছুই তার অজানা নয়। হৃদয়ের স্পন্দন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আচরণ—সবকিছু সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। তিনি জানেন, কে মুমিন ও নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমানের অধিকারী আর কে মুনাফিক ও কপট বিশ্বাসধারী; কে আন্তরিক ও সত্যবাদী আর কে প্রতারক ও মিথ্যাবাদী।

জীবনের পদে পদে ঈমানি পরীক্ষা

এই সম্যক অবগতির পরও আল্লাহ তাআলা আপন বান্দাদের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু পরীক্ষা রেখেছেন। এসব পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানবহৃদয়ের গোপন অবস্থা প্রকাশ করে দেন এবং তাদের পরিচয় জনসমাজে উন্মোচিত করে দেন। সুস্পষ্ট হয়ে যায়, কারা কর্মে ও দাবিতে এক নয়, কারা বিশ্বাসে ও আচরণে অভিন্ন নয়।

পাঠকমনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা তো প্রত্যেকের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। তাহলে পরীক্ষার মাধ্যমে তা উন্মোচনের কী প্রয়োজন?

উত্তর হলো, প্রয়োজন আছে। এর মাধ্যমে কপট ও প্রতারকদের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়! কাল কিয়ামতের দিন বিচার-দিবসে তাদের কারও এই দাবি করার সুযোগ থাকবে না যে, আমার প্রতি জুলুম ও অবিচার করা হয়েছে। কারণ, পার্থিব জীবনে তাকে পরীক্ষা করা হয়েছিল, আর সে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছিল।

ঈমানি এই পরীক্ষার আরেকটি উদ্দেশ্য আছে। আল্লাহ তাআলা এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে মুমিনদের জামাতকে মুনাফিকমুক্ত করেন! এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ঈমানদারদের প্রতি এক অপার অনুগ্রহ। কেননা, মুনাফিকদের সংমিশ্রণ মুসলিম জামাতের অবস্থান দুর্বল করে, বিভেদ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং দুর্যোগ ও পরাজয় টেনে আনে।

আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন—

﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَّلَأَوْضَعُوا خِلَٰلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّٰعُونَ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌۢ بِالظَّٰلِمِينَ﴾

তারা তোমাদের সঙ্গে বের হলে তোমাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ছাড়া অন্য কিছু বৃদ্ধি করত না এবং তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টায় তোমাদের সারিসমূহের মধ্যে ছোটাছুটি করত। আর তোমাদের মাঝে রয়েছে তাদের গুপ্তচর। আল্লাহ জালিমদের সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন।

[সুরা তাওবা : ৪৭]

সুতরাং মুমিন-মুনাফিক পার্থক্যকরণ ও সত্যবাদী-মিথ্যাবাদী পৃথককরণের জন্য এ জাতীয় পরীক্ষার ব্যবস্থা করা মুমিনদের প্রতি মহান আল্লাহ তাআলার অসীম দয়া ও রহমতের-ই বহিঃপ্রকাশ।

ঈমানি পরীক্ষা মহান আল্লাহর চিরন্তন রীতি, শাশ্বত সুন্নাত। পৃথিবীর প্রথম মানুষ হজরত আদম আ. হতে কিয়ামত পর্যন্ত আগত-বিগত সকল মানুষের জন্যই ব্যতিক্রমহীনভাবে আল্লাহ তাআলার পরীক্ষানীতি কার্যকর। পবিত্র কুরআনে এই শাশ্বত নীতির কথা এভাবে বিবৃত হয়েছে—

﴿الٓمٓ ۝ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوٓا أَنْ يَقُولُوٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ﴾

আলিফ-লাম-মিম। মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই পরীক্ষা না করে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে? অথচ তাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে, তাদেরকেও আমি পরীক্ষা করেছি। সুতরাং আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে এবং তিনি অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী। [সুরা আনকাবুত : ১-৩]

ঈমানি পরীক্ষার রীতি ও বৈশিষ্ট্য

এসব ঈমানি পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুনির্দিষ্ট কিছু নীতি-বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

প্রথমত পরীক্ষা হতে হবে কঠিন। কারণ, পানির মতো সহজ পরীক্ষা হলে তো মুমিন-মুনাফিক সকলেই নির্বিশেষে পাশ করবে এবং কাঙ্ক্ষিত পার্থক্যকরণও অর্জিত হবে না।

দ্বিতীয়ত পরীক্ষা এত কঠিন হতে পারবে না যে, বান্দার জন্য অসাধ্য ও অসম্ভব বিবেচিত হয়। অসাধ্য বিষয়ে পরীক্ষা হলে তো মুমিন ও মুনাফিক উভয় শ্রেণিই অকৃতকার্য হবে।

সুতরাং ঈমানি পরীক্ষা হতে হবে ভারসাম্যপূর্ণ। এত কঠিন নয় যে, মুমিনরাও ফেল করে; এত সহজ নয় যে, মুনাফিকরাও পাশ করে। এতটুকু কঠিন যে, মুনাফিকরা পাশ করার সামর্থ্য না রাখে, এতটুকু সাধ্যের ভেতর যে, মুমিনদের পাশ করার সুযোগ থাকে।

একজন মানুষ শরিয়তের দৃষ্টিতে মুকাল্লাফ ও ভারার্পিত হওয়ার পর থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় নানা ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ 'কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ' একটি পরীক্ষা। অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা; কিন্তু অসাধ্য নয়। নিষ্ঠাবান মুমিন বান্দা এ পরীক্ষায় পাশ করে, আর ঈমানের কপট দাবিদাররা সভয়ে পিছিয়ে পড়ে।

আল্লাহর রাস্তায় দান করা একটি পরীক্ষা। কঠিন পরীক্ষা; কিন্তু অসম্ভব ও অসাধ্য নয়। মুমিন এ পরীক্ষায় পাশ করতে পারে, মুনাফিক পারে না।

মানুষের সঙ্গে সদাচরণ একটি পরীক্ষা।

ক্রোধ সংবরণ একটি পরীক্ষা।

তাকদির ও আল্লাহ তাআলার ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা একটি পরীক্ষা।

মাতা-পিতার সঙ্গে সদাচরণ একটি পরীক্ষা।

এভাবে জীবনের বাঁকে-বাঁকে পরতে-পরতে অসংখ্য পরীক্ষা।

বরং গভীরভাবে চিন্তা করলে পার্থিব জীবনটাই এক পরীক্ষা।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন—

﴿الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ﴾

যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, কর্মে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম। তিনিই পরিপূর্ণ ক্ষমতার মালিক, অতি দয়াশীল। [সুরা মুল্‌ক : ০২]

ঈমানি বিভিন্ন পরীক্ষা যদিও সহজ-কঠিন বিবেচনায় সমস্তরের নয়; কিন্তু শেষ বিচারে সবই পরীক্ষা। ঈমানের দাবিকে সত্য প্রমাণ করতে চাইলে প্রতিটি পরীক্ষাতেই কৃতকার্য হতে হবে। এটাই নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমানের দাবি।

ফজরের নামাজ এক ঈমানি পরীক্ষা!

এমনই অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ঈমানি পরীক্ষা হলো ফজরের নামাজের পরীক্ষা! পরীক্ষাটি কঠিন; কিন্তু অসাধ্য নয়।

ফজরের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নাম্বার প্রাপ্তির পথ হলো পুরুষদের জন্য মসজিদে জামাতের সঙ্গে নিয়মিত ফজরের নামাজ আদায় করা আর নারীদের জন্য নিয়মিত ঘরেই প্রথম ওয়াক্তে নামাজ আদায় করে নেওয়া। আর অতি গুরুত্বপূর্ণ এই পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা হলো নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায়ে সক্ষম না হওয়া।

তবে সর্বোচ্চ নাম্বার প্রাপ্তি ও অকৃতকার্যতার মাঝে আছে অনেকগুলো স্তর।

একজন হয়তো অধিকাংশ সময় মসজিদেই নামাজ আদায় করেন; কিন্তু মাঝে মধ্যে মসজিদের জামাত ছুটেও যায়।

আরেকজনের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। মাঝে মধ্যে মসজিদে নামাজ আদায় করেন; অধিকাংশ নামাজেই জামাত ছুটে যায়।

কেউ হয়তো ফজরের নামাজ নিয়মিত ঘরেই আদায় করেন; অবশ্য ওয়াক্তের মধ্যেই।

আবার কেউ ঘরেই নামাজ আদায় করেন; তবে প্রতিদিনই ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর!

স্তর যদিও অনেক; কিন্তু নিষ্ঠাবান মুমিন বান্দার কাঙ্ক্ষিত সফলতার স্তর হলো নিয়মিত মসজিদে জামাতের সঙ্গে ফজরের নামাজ আদায় করা।

প্রশ্ন হতে পারে, ফজরের নামাজ কতটা গুরুত্বপূর্ণ?!

এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাজকে মুমিন ও মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য-নির্ণয়কারী সাব্যস্ত করেছেন!

শাইখাইন রহ.[১] হজরত আবু হোরায়রা রাযি. হতে বর্ণনা করেন, নবীজি ইরশাদ করেছেন—

«إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيْ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُوْنَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ»

মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে কঠিন নামাজ হলো এশা ও ফজরের নামাজ। এই দুই নামাজের ফজিলত তারা যদি জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও নামাজে উপস্থিত হতো। আমার মনে চায় যে, আমি (নামাজের সময় হলে) নামাজের নির্দেশ দিই। এরপর একজনকে নির্দেশ দিই যে, সে উপস্থিত লোকদের নিয়ে নামাজ আদায় করুক। আর আমি লাকড়ির বোঝাসহ একদল লোক নিয়ে তাদের কাছে চলে যাই, যারা নামাজে উপস্থিত হয়নি। এরপর তাদের ঘর তাদের-সহ আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিই।[২]

ভেবে দেখুন, অন্যায় কত বড়! অপরাধ কত ভয়াবহ! উম্মাহর প্রতি কল্যাণকামী ও পরম দয়ার্দ্র হওয়া সত্ত্বেও প্রিয় নবীজি চাচ্ছেন ফজরের জামাতে অনুপস্থিত ব্যক্তিকে ঘরসহ জ্বালিয়ে দিতে!

আল্লাহর শপথ! বাহ্যত চরম কঠোরতা মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এ উক্তির মাঝে ফুটে উঠেছে পরম স্নেহশীল নবীজির উম্মাহপ্রীতির এক অনুপম চিত্র। নবীজি তো চাচ্ছেন উম্মতকে দুনিয়ার আগুনের ভয় দেখিয়ে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে। আহ! কত পার্থক্য দুনিয়ার আগুন ও জাহান্নামের অগ্নির তাপ ও তীব্রতায়!

---

১. ইমাম বুখারি রহ. ও ইমাম মুসলিম রহ.-কে একত্রে 'শাইখাইন' বা হাদিস শাস্ত্রের মহান ইমামদ্বয় বলা হয়। [অনুবাদক]

২. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং-৬৪৪ ও *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং-৬৫১।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারও ঈমানের বিষয়ে পূর্ণ আশ্বস্ত না হলে তাকে ফজরের সময় মসজিদে খোঁজ করতেন। ফজরের জামাতে তাকে উপস্থিত না পেলে নবীজির সন্দেহ নিশ্চিত বিশ্বাসে রূপ নিত।

হজরত উবাই বিন কাব রাযি. বর্ণনা করেন, নবীজি একদিন ফজরের নামাজ আদায় করার পর সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন—

'অমুক কি নামাজে এসেছে?' উপস্থিত সাহাবিগণ বলল, 'না।' নবীজি জিজ্ঞেস করলেন, 'অমুক?' সকলে উত্তর দিল, 'না।' তখন নবীজি বললেন—'এই দুটি নামাজ (ফজর ও এশা) মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে কঠিন নামাজ। তারা যদি এই দু-নামাজের ফজিলত জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও উপস্থিত হতো।'[৩]

মসজিদে জামাতের সঙ্গে ফজরের নামাজ আদায়ে কী কল্যাণ নিহিত আছে, তা মুনাফিকরা উপলব্ধি করতে পারে না। তারা যদি এ কল্যাণ উপলব্ধি করতে পারত, তাহলে যেকোনো অবস্থাতে মসজিদে চলে আসত; যেমনটি নবীজি বলেছেন—'হামাগুড়ি দিয়ে হলেও উপস্থিত হতো।'

আপনি একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তির কথা কল্পনা করুন, যিনি নিজে নিজে চলতে পারেন না। আবার তাকে হাঁটতে সহায়তা করার মতো কেউ নেই। তা সত্ত্বেও তিনি মসজিদে জামাতে নামাজ পড়ার প্রশ্নে অটল-অবিচল। মসজিদে জামাতের সঙ্গে ফজরের নামাজ আদায়ের ফজিলত ও কল্যাণ লাভ করার জন্য তিনি মাটিতে হামাগুড়ি দিতে দিতেই চলে যান মসজিদে। তাহলে সুস্থ ও পায়ে হেঁটে মসজিদে আসতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও যারা অনুপস্থিত থাকে ফজরের জামাতে, হাদিসের দৃষ্টিতে তাদের অবস্থান কোথায়?! হায়! পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ!

স্বাভাবিকভাবেই এর অর্থ এই নয় যে, আমাদের সমাজে যারা নিয়মিত ফজরের নামাজ জামাতের সঙ্গে মসজিদে আদায় করে না, তাদেরকে আমরা মুনাফিক গণ্য করব। আমি ও আমরা তো কারও প্রতি বিধান আরোপের অধিকার রাখি না। আল্লাহই প্রতিটি মুসলমানের পরিস্থিতি সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত। আমার

উদ্দেশ্য হলো—আমরা যেন প্রত্যেকে আপন অবস্থা যাচাই করে নিই; আমরা যেন নিজ পরিবার-পরিজন, স্ত্রী-সন্তান ও আপনজনদের এই পরীক্ষার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

কোনো ব্যক্তি যদি নিয়মিত ফজর আদায়ে অবহেলা করে, নিঃসন্দেহে এটি তার নিফাক ও কপটতার সুস্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হবে। এ অভ্যাস যার মধ্যে আছে, তার কর্তব্য দ্রুত নিজের অবস্থা নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনা করা। কারণ, নিশ্চিত করেই তার মন্দ পরিণতির আশঙ্কা রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ও সকল মুসলমানকে সুস্থতা, নিরাপত্তা ও সুপরিণতি দান করুন।

* * *

ফজরের নামাজ আদায় করতে হবে ফজরের ওয়াক্তেই

আমি একবার কয়েকজন বন্ধুর সামনে ফজরের নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তখন উপস্থিত এক বন্ধুর সঙ্গে আমার নিম্নোক্ত কথোপকথন হয়েছিল।

বন্ধুটি বলল, 'আলহামদুলিল্লাহ! আমি ফজরের নামাজ আদায় না করে ঘর থেকে বের হই না।'

'আপনি ঘুম থেকে কখন ওঠেন?' আমি কথাপ্রসঙ্গে তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

: 'এই সাড়ে সাতটার দিকে! ঘুম থেকে উঠে আমার প্রথম কাজই হলো অজু করে ফজরের নামাজটা আদায় করে নেওয়া।' বন্ধুর নির্দোষ উত্তর!

আমি অবাক বিস্ময়ে বললাম 'সুবহানাল্লাহ! ততক্ষণে তো ফজরের ওয়াক্তই শেষ হয়ে যায়!'

: 'কী বলছেন?! আমি তো জানি, প্রত্যেক নামাজ পরবর্তী নামাজের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত আদায় করার সুযোগ থাকে। ফজরের ওয়াক্ত কি সুবহে সাদিক (উষাকাল) হতে জোহরের ওয়াক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত নয়?'

: 'ফজরের নামাজ ছাড়া অন্যান্য ফরজ নামাজের ক্ষেত্রে আপনার জানা ঠিক আছে; কিন্তু ফজরের নামাজের নির্ধারিত সময় হলো সুবহে সাদিক হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত। ফজরের এই সুনির্দিষ্ট সময় তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত ও কঠিন। এ কারণেই ফজরের নামাজ মুসলমানের জন্য এক ঈমানি পরীক্ষা। ফজরের ওয়াক্ত যদি জোহরের ওয়াক্ত পর্যন্ত উন্মুক্ত-ই থাকত, তাহলে আর পরীক্ষা হলো কোথায়?! ফরজ নামাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত নামাজ হলো ফজরের নামাজ, মাত্র দু রাকাত; কিন্তু এই দু রাকাত নামাজকেই ঈমানের মানদণ্ড হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে সময়-সংক্ষিপ্ততা ও কাঠিন্য বিবেচনা করেই।' আমি একটানা বলে গেলাম।

আমার একজন বন্ধু দ্বীনের এত সুস্পষ্ট ও একান্ত মৌলিক এ বিষয়টি জানে না, এ বিষয়টি উপলব্ধি করে আমি যতটা অবাক হলাম, তারচেয়ে বেশি ব্যথিত হলাম এ কথা চিন্তা করে যে, হায়! মুসলিম সমাজে ইসলামি শিক্ষা বর্তমানে কতটা নিম্ন স্তরে পৌঁছেছে! আমাদের যাপিত সমাজের কিছু মুসলমান কিংবা অধিকাংশ মুসলমান ফজরের নামাজের সঠিক সময় পর্যন্ত জানে না! আমরা তো চাশতের নামাজ বা তাহাজ্জুদের নামাজ নিয়ে কথা বলছিলাম না; কথা বলছিলাম ফজরের নামাজের সময় নিয়ে!

আরেকটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। ঘটনাটি যুগপৎ কৌতুকপ্রদ ও বেদনাদায়ক। একটি রাজনৈতিক দলের তরুণ ও নবীন কর্মীদের প্রশিক্ষণ চলছিল। প্রশিক্ষণকেন্দ্রের বিভিন্ন কামরার দেয়ালে দৈনন্দিন কর্মসূচি ঝোলানো ছিল। তালিকায় উল্লেখিত প্রথম কর্মসূচিই ছিল—

'সকাল আটটায় শয্যাত্যাগ ও ফজরের নামাজ আদায়'!

সেদিনও আমি বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম। ওয়াল্লাহি! এ তো পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে পরিকল্পনা করে অন্যায়ের আয়োজন! দ্বীনের একটি ফরজ বিধান লঙ্ঘন করার সুস্পষ্ট ও পরিকল্পিত সংকল্প! আল্লাহর পানাহ!

প্রতিটি ফরজ নামাজের ওয়াক্ত শরিয়তের পক্ষ থেকে সুনির্ধারিত। এক্ষেত্রে মানবিক চিন্তা-ভাবনা, যুক্তি-তর্ক, ইজতিহাদ ও স্বাধীন মতামত প্রয়োগের কোনো সুযোগ নেই। হাদিস শরিফে প্রতিটি নামাজের ওয়াক্ত সুস্পষ্টভাবে সূক্ষ্ম বর্ণনার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে এবং কোনো প্রকার ভুল বা অস্পষ্ট ধারণার অবকাশই রাখা হয়নি।

আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

«وَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ»

ফজরের নামাজের ওয়াক্ত ভোরের উষার উদয় হতে যতক্ষণ না সূর্যোদয় হয়।(৪)

সুতরাং ফজরের নামাজের নির্ধারিত সময় একেবারেই সুস্পষ্ট ও সংশয়মুক্ত। তিরমিজি শরিফে হজরত আবু হোরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত অন্য এক হাদিসে নবীজি বিষয়টি আরও সুদৃঢ় করেছেন এভাবে—

«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ»

যে ব্যক্তি ফজরের নামাজের এক রাকাত সূর্যোদয়ের পূর্বে পেল, সে ফজরের নামাজ (ওয়াক্তের মধ্যে) পেল।[৫]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের[৬] পূর্বেই এক রাকাত পেল, সে ফজরের নামাজ ওয়াক্তমতো পড়েছে বলে ধর্তব্য হবে। আর যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে এক রাকাতও পড়তে পারল না, তার ফজরের নামাজ কাজা হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে এটি লক্ষণীয় একটি বিষয়।

এরচেয়েও অধিক লক্ষণীয় বিষয় হলো, কেবল সূর্যোদয়ের পূর্বে নামাজ আদায়ের মাধ্যমেই ঈমান ও নিফাক নির্ণয়ের পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া যাবে না; বরং এই পরীক্ষায় প্রকৃত সফলতা অর্জন করতে হলে ফজরের নামাজ ঘরের পরিবর্তে মসজিদে জামাতের সঙ্গে আদায় করতে হবে। এ কথা পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য। নারীদের যদিও মসজিদে নামাজ পড়ার অনুমতি আছে; কিন্তু ঘরে নামাজ আদায় করা-ই তাদের জন্য শ্রেয়তর ও অধিক ফজিলতপূর্ণ।[৭] হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

---

৫. *জামে তিরমিজি*, হাদিস নং-৪২৩।

৬. সূর্যোদয় দ্বারা পূর্ণ উদয় উদ্দেশ্য নয়; বরং উদয়ের সূচনা উদ্দেশ্য। [অনুবাদক]

৭. বিভিন্ন হাদিসে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে যে, নারীদের জন্য মসজিদে নামাজ আদায়ের চেয়ে ঘরে নামাজ আদায় করাই শ্রেয়তর ও অধিক ফজিলতপূর্ণ। তবে একদিকে যেহেতু নারী সাহাবিদের নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামাজ আদায়ের প্রচণ্ড আগ্রহ-উদ্দীপনা ছিল, অপরদিকে ওহি অবতরণের কাল হওয়ায় পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও নতুন শরিয়ত সম্বন্ধে অবগতির প্রয়োজন ছিল, অধিকন্তু তখন বিদ্যমান ছিল নবীসংস্পর্শে গড়ে ওঠা সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ সমাজ—এ জাতীয় বিভিন্ন দিক বিবেচনায় নবীজি নারীদেরকে মসজিদে জামাতে শরিক হতে নিষেধ করেননি। নারী সাহাবিগণ=

«لَا تَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»

তোমরা তোমাদের নারীদের মসজিদে যেতে বাধা দিয়ো না। তবে তাদের ঘরই তাদের (নামাজ আদায়ের) জন্য শ্রেয়তর।[৮]

=সাধারণত মাগরিব, এশা ও ফজর অর্থাৎ অন্ধকার সময়ের নামাজগুলোতে মসজিদে জামাতে শরিক হতেন।

নবীজির ইন্তেকালের মাধ্যমে এই ফজিলত ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সমাপ্ত হয়ে যায়। অধিকন্তু পরবর্তী সময়ে নারীরা দিনের নামাজগুলোতেও অধিক পরিমাণে মসজিদে আসতে শুরু করে এবং নবীযুগে মসজিদে গমনকারী নারী সাহাবিদের মধ্যে যে পরিমাণ সতর্কতা, সযত্ন পর্দারক্ষা ও সাজসজ্জার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নির্লিপ্ততা ছিল, ধীরে ধীরে তাতেও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এ কারণে দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর রাযি. নারীদেরকে মসজিদে জামাতে শরিক হতে নিষেধ করেন। তার এই সিদ্ধান্তে সাহাবায়ে কেরাম কোনো প্রকার আপত্তি না করে বরং সমর্থন প্রদান করেন। এমনকি আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা রাযি. বলেন,

«لَوْ أَدْرَكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ»

এখনকার নারীরা যা করছে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তা দেখতে পেতেন, তাহলে তিনি তাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করে দিতেন, যেমন বনি ইসরাইলের নারীদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। [*সহিহ বুখারি*, হাদিস নং-৮৬৯]

ভাবনার বিষয় হলো, খলিফা উমর রাযি.-এর এই নিষেধকরণ এবং আম্মাজান আয়েশা রাযি.-এর এই শরয়ি বোধ ও উপলব্ধি ছিল নবীজির ইন্তেকালের মাত্র কয়েক বছর পরেই। তাহলে আমাদের বর্তমান ফিতনাপূর্ণ সমাজে মাসআলা কী হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। এ কারণেই হানাফি ফুকাহায়ে কেরাম নারীদের জন্য সকল নামাজেই মসজিদে উপস্থিতি নিষিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, ফিকহের পরিভাষায় এই নিষেধাজ্ঞা 'নাহি লি-গাইরিহি'-এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ মৌলিকভাবে নারীদের জন্য মসজিদ গমন বৈধ হলেও পারিপার্শ্বিক কারণে তা নিষিদ্ধ। অতএব, (সাময়িক কোনো প্রয়োজনে অথবা প্রয়োজন ব্যতিরেকেও) নারীরা যদি মসজিদে নামাজ আদায় করে, তাহলে মূল নামাজ আদায় হয়ে যাবে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : ১. মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি, *ইনআমুল বারি শরহু সহিহিল বুখারি*, ৩/ ২ ও মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি, *তুহফাতুল কারি শরহু সহিহিল বুখারি*, ২/১২৩-১২৫, ৩/১৮৯-১৯০। [অনুবাদক]

৮. *সুনানে আবি দাউদ*, হাদিস নং-৫৬৭।

হজরত উম্মে হুমাইদ সাঈদিয়্যা রাযি. বর্ণনা করেন, আমি একদিন নবীজির দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলাম, 'আল্লাহর রাসুল, আমি তো আপনার সঙ্গে (জামাতে) নামাজ আদায় করতে পছন্দ করি।'

নবীজি উত্তর দিলেন,

«قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّيْنَ الصَّلَاةَ مَعِيْ، وَصَلَاتُكِ فِيْ بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِيْ حُجْرَتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِيْ حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِيْ دَارِكِ، وَصَلَاتُكِ فِيْ دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِيْ مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلَاتُكِ فِيْ مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِيْ مَسْجِدِيْ»

আমি জানি, তুমি আমার সঙ্গে নামাজ আদায় করতে পছন্দ করো। তবে তোমার জন্য নিজ কক্ষে নামাজ আদায় করা ঘরে নামাজ আদায়ের চেয়ে উত্তম; ঘরে নামাজ আদায় বাড়িতে নামাজ আদায়ের চেয়ে উত্তম; বাড়িতে নামাজ আদায় এলাকার মসজিদে নামাজ আদায়ের চেয়ে উত্তম এবং এলাকার মসজিদে নামাজ আদায় করা আমার মসজিদে নামাজ আদায়ের চেয়ে উত্তম।[৯]

নারীদের জন্য ঘরেই নামাজ আদায়ে অধিক সাওয়াবের এই ঘোষণা নিঃসন্দেহে সমাজের প্রতি মহান আল্লাহ তাআলার এক অপার অনুগ্রহ-দান। এ বিধান নারীদেরকে ফিতনা থেকে হেফাজত করবে এবং আবরু ও পর্দা রক্ষায় সহায়তা করবে। অধিকন্তু বাড়িতে থাকা শিশু ও বয়োবৃদ্ধদের দেখাশোনাও সহজ হবে। কত মহান আমার আল্লাহ! কত সুষম ও সুদৃঢ় তার প্রণীত শরিয়ত-বিধান!

মোটকথা, ঈমান ও নিফাকের এই পরীক্ষায় নারীদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সফলতার মাপকাঠি হলো প্রথম ওয়াক্তেই ঘরে নামাজ আদায় করে নেওয়া। যে নারী ফজরের নামাজ কোনোমতে সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্তে আদায় করে নেয় কিংবা যার পুরো ফরজই ছুটে যায়; ফজরের নামাজ আদায় করে সূর্যোদয়ের পর, তার অবস্থা তো বড় ভয়াবহ! তার হৃদয়ে তো ঈমান ও ঈমানের দাবি এখনও বদ্ধমূল হতে পারেনি।

---

৯. ইমাম আহমাদ, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং-২৭০৯০।

প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন,

আমি আপনাদের জীবনকে কঠিন ও কষ্টসাধ্য করে তুলতে চাচ্ছি না। আমি চাচ্ছি না অসাধ্য কোনো বিষয়ে আপনাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে। আল্লাহর শপথ! আমি তো কথা বলছি ইসলামি শরিয়তের একটি বাস্তব বিধান নিয়ে; আমি আলোচনা করছি এমন সুস্পষ্ট-সুদৃঢ় আয়াত ও হাদিসের আলোকে, যাতে কোনো অস্পষ্টতা বা মর্ম-অসঙ্গতি নেই। আমি কথা বলছি উম্মাহর উলামায়ে কেরামের ঐকমত্য দ্বারা প্রমাণিত একটি বিষয়ে, যেখানে কোনো মতভিন্নতা নেই।

যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সূর্যোদয়ের পর ফজরের নামাজ পড়ে, সে স্বেচ্ছায় দ্বীনের একটি ফরজ বিধান পরিত্যাগ করে। নিঃসন্দেহে এটি অত্যন্ত ভয়াবহ একটি বিষয়।

হজরত উম্মে আইমান রাযি. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«لَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّه مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ وَرَسُولِه»

(কোনো ওজর ব্যতিরেকে) ইচ্ছে করে নামাজ ছেড়ো না। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে নামাজ পরিত্যাগ করে, তার প্রতি আল্লাহ ও তার রাসুলের কোনো দায়িত্ব থাকে না।[১০]

ফজরের নামাজ পড়ার জন্য যে ব্যক্তি ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখে সাতটা বা সাড়ে সাতটায়; অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পরে, সে তো স্বেচ্ছায়ই নামাজ তরক করছে! এ অন্যায়ের কঠিন পরিণাম ও দায়দায়িত্ব তো তার ওপরই বর্তাবে!

যথাসময়ে নামাজ আদায় আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল!

এবার অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে যথাসময়ে ফজরের নামাজ আদায়ের গুরুত্ব অনুধাবন করুন।

'আল্লাহ তাআলার কাছে বান্দার কোন আমল সবচেয়ে বেশি প্রিয়?'

---

১০. ইমাম আহমাদ, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং-২৭৩৬৪।

বিশিষ্ট ফকিহ সাহাবি হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. প্রিয় নবীজির কাছে এ বিষয়টিই জানতে চেয়েছিলেন। শাইখাইন রহ.-এর বর্ণনামতে নবীজি উত্তর দিয়েছিলেন, 'আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল হলো যথাসময়ে নামাজ আদায় করা।' ইবনে মাসউদ রাযি. এরপর জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর কোন আমল অধিক প্রিয়?' নবীজি উত্তর দিলেন, 'মাতা-পিতার সঙ্গে সদাচরণ করা।' ইবনে মাসউদ জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর কোনটি?' নবীজির উত্তর, 'আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করা।'[১১]

প্রিয় পাঠক, দেখুন, নবীজি যথাসময়ে নামাজ আদায়ের কথা মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ বিধানেরও পূর্বে উল্লেখ করলেন! উল্লেখ করলেন ইসলামের শীর্ষ চূড়া জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহরও পূর্বে!

জানি না, এরপরও কীভাবে একজন মুসলমানের দৈনন্দিন কর্মসূচি থেকে ফজরের নামাজ বাদ পড়ে যায়?!

আপনি দেখবেন, যারা নিয়মিত নামাজ আদায় করে, তাদের অধিকাংশের অবস্থা হলো তারা আছরের আজানের পূর্বে জোহর নামাজের চিন্তা করে! আছর পড়তে উদ্যোগী হয় মাগরিবের আজানের সামান্য পূর্বে। আর ফজরের নামাজ? এ ফরজ বিধান যেন দিনে দিনে অদৃশ্যই হয়ে যাচ্ছে!

আল্লাহ তাআলা মাফ করুন। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

অসম্ভব হওয়াটাই যেখানে অসম্ভব!

উপস্থিত আরেক বন্ধু আমাকে বললেন, 'ফজরের নামাজের নির্ধারিত সময় আমার জানা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত ভোরে ঘুম থেকে জাগা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না! সম্ভব হবে কী করে বলুন! আমার অবস্থা তো আপনি জানেন না; সারাদিনের হাড়-ভাঙা পরিশ্রমের পর ক্লান্ত-শ্রান্ত শরীরে অনেক রাতে আমাকে বিছানায় যেতে হয়। ভোরে যখন ফজরের আজান হয়, তখন দেহ-মন বিছানা ছাড়তে কিছুতেই সায় দেয় না। আর আপনি তো জানেন, আল্লাহ তাআলা পরম দয়াবান ও ক্ষমাশীল। তিনি অবশ্যই আমার অপারগ অবস্থা বিবেচনা করে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন!'

আমি তাকে বললাম, আপনি যেমন বললেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। কথা যদিও শতভাগ সত্য; কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তার ব্যবহার মোটেও সঠিক নয়! এটি শয়তানের প্রবঞ্চনা বৈ অন্য কিছু নয়! আল্লাহ তাআলা যদি সৎ-অসৎ, সত্যবাদী-মিথ্যাবাদী, অনুগত-অবাধ্য, শরিয়ত-অনুরাগী ও শরিয়ত-বিরাগী সকলকেই নির্বিচারে ক্ষমা করে দেন, তাহলে কী প্রয়োজন নেক আমলের? কী উদ্দেশ্যে এত কর্মপ্রচেষ্টা? কেন আল্লাহর অনুগত বান্দারা কঠোর ও সুকঠিন মোজাহাদা করে? কেন তারা কনকনে শীতের রাতেও বিছানা ছেড়ে শীতের তীব্রতা উপেক্ষা করে মসজিদ-পানে ছোটে?

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল ও দয়ালু। কিন্তু আল্লাহ তাআলা কাদের ক্ষমা করেন? আল্লাহ তাআলার দয়া ও করুণা কাদের জন্য? আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেন, যারা ক্ষমালাভে সচেষ্ট হয়। শুধু মুখে ক্ষমাপ্রার্থনা যথেষ্ট নয়; ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য নেক আমলও জরুরি। কুরআন কী বলেছে, দেখুন—

﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ﴾

আর যে ব্যক্তি ঈমান আনে, সৎকর্ম করে, অতঃপর সরল পথে প্রতিষ্ঠিত থাকে, আমি তার পক্ষে পরম ক্ষমাশীল। [সুরা ত্বহা : ৮২]

ভালো করে লক্ষ করুন, আয়াতে এ কথা বলা হয়নি যে, আল্লাহ তাআলা সকল মানুষকে ক্ষমা করে দেবেন। বরং আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ক্ষমালাভের জন্য আন্তরিক তাওবা, নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমান, সৎ কর্ম ও হিদায়াতের শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানে মহান আল্লাহ তাআলার অপার ক্ষমা ও দয়ার গুণের সঙ্গেই শাস্তিদান, আজাবপ্রদান ও প্রতিশোধগ্রহণের গুণও আলোচিত হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে—

﴿نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾

আমার বান্দাদের জানিয়ে দিন যে, নিশ্চয়ই আমিই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। এটাও জানিয়ে দিন যে, আমার শাস্তিই মর্মন্তুদ শাস্তি।

[সুরা হিজর : ৪৯-৫০]

আয়াতে ক্ষমার পাশাপাশি মর্মন্তুদ আজাবের কথাও বলা হয়েছে। মূলত উভয়ের সম্মিলনেই মানবজীবনে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়।

বাকি আপনি যে বললেন, ফজরের সময় জাগ্রত হওয়া আপনার জন্য অসম্ভব, এ সম্পর্কে আমার কথা হলো, কোনো মানুষের পক্ষে ভোরে ফজরের নামাজের নির্ধারিত সময়ে জাগ্রত হওয়া অসম্ভব—এ কথাটি যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনার দাবি রাখে।

ফজরের জন্য জাগ্রত হওয়া আপনার পক্ষে অসম্ভব—এটি যে সম্পূর্ণই অসার একটি দাবি, আমার এতে এক মুহূর্তের জন্যও সামান্য সংশয়-সন্দেহ নেই!

আপনি জানতে চান, আমার এই বিশ্বাস ও সংশয়হীনতার উৎস কী?

তাহলে শুনুন এবং আমার সঙ্গে আপনিও একটু ভাবুন।

এক.

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

﴿لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا﴾

আল্লাহ কারও ওপর তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব অর্পণ করেন না।

[সুরা বাকারা : ২৮৬]

এটি ইসলামি শরিয়তের একটি সর্বজনীন মূলনীতি। আর ইসলামি শরিয়ত ও শরিয়তের মূলনীতিসমূহ কোনো মানবরচিত আইন নয় যে, তাতে উপযোগী-অনুপযোগী উভয় ধরনের বিধান সন্নিবেশিত থাকবে। ইসলামি শরিয়ত জগৎসমূহের প্রতিপালক মহান আল্লাহ পাক কর্তৃক প্রণীত। এ শরিয়ত তিনি প্রণয়ন করেছেন, যিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের শক্তি ও সামর্থ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও পূর্ণ অবগতি রাখেন।

﴿اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؕ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ﴾

যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি জানবেন না?! অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত!

[সুরা মুল্‌ক : ১৪]

অতএব শরিয়তের কোনো বিধানই মানুষের সাধ্যাতীত নয়। আমার এ বিষয়ে কোনো দ্বিধা-সংশয় নেই।

সুতরাং প্রিয় পাঠক, প্রথমে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, নির্ধারিত সময়ে ফজরের নামাজ আদায়ের বিধান একটি ফরজ ও অবশ্য-পালনীয় বিধান, না-কি আবশ্যকীয় নয়? ফজরের নামাজ প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর ওপর ফরজ, না-কি বিশেষ কোনো শ্রেণি ও গোষ্ঠী এর আওতামুক্ত? নিঃসন্দেহে উত্তর সুস্পষ্ট; ফজরের নামাজ সকল মুসলমানের ওপর ফরজ। তাহলে একজন মুসলমান কীভাবে বিশ্বাস করতে পারে যে, ফজরের ফরজ বিধান তার জন্য সাধ্যাতীত ও অসাধ্য?! প্রত্যেক মুসলমান যেহেতু আল্লাহ তাআলার ন্যায় ও ইনসাফ, হিকমত ও প্রজ্ঞা এবং অসীম ইলমের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সুতরাং বিশ্বাসী কোনো মুসলমানের জন্য ফজরের নির্ধারিত সময়ে জাগ্রত হওয়া অসম্ভব মনে করা সমীচীন নয়।

ফজরের ওয়াক্তে শয্যাত্যাগ করা যে মোটেও অসাধ্য ও অসম্ভব নয়, এটি তার প্রথম প্রমাণ।

দুই.

এবার আমেরিকান জনজীবনে পর্যবেক্ষণ করা আমার কিছু অভিজ্ঞতা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

[দৃশ্যপট এক]

আমেরিকা সফরে আমি একদিন শহরের মসজিদে ফজরের নামাজ আদায় করে ফিরছিলাম। সকাল ছয়টার মতো বাজে। মসজিদ থেকে বেরিয়ে দেখতে পেলাম মহাসড়ক ও দ্রুতগামী সকল রাস্তা-ঘাট গাড়িতে পূর্ণ! প্রথম দেখায় আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমি আবার রাস্তাগুলোর দিকে তাকালাম। আমেরিকাবাসী তাদের কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য খুব ভোরে জেগে উঠেছে। তাদের অনেকের কর্মস্থল বাসস্থান থেকে অনেক দূরে। তাই কর্মস্থলে যথাসময়ে পৌঁছার জন্য বাধ্য হয়ে তারা ভোর পাঁচটায়-ই শয্যাত্যাগ করে। এই মানুষগুলো ধর্মপরিচয়ে খ্রিষ্টান বা ইহুদি; বরং তাদের অনেকেই নাস্তিক ও ধর্মবিদ্বেষী। তারা কেবল জাগতিক প্রয়োজনের দাবীতে ফজরের নির্ধারিত সময়ে জেগে উঠেছে। মানবিক শক্তি-সামর্থ্যই তাদেরকে এত ভোরে বিছানা ছাড়তে অনুমতি দিয়েছে। তাহলে একজন মুমিন কেন পারবে না ফজরের সময় শয্যাত্যাগ করতে?!

[দৃশ্যপট দুই]

একবার আমেরিকার এক শহরে স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি বিরাট কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলাম। আমেরিকায় যাওয়ার পর হঠাৎ করেই জানতে পারলাম, কনফারেন্সের অধিবেশনগুলো ভোর ছয়টায় শুরু হবে!

প্রিয় পাঠক, আল্লাহর শপথ করে বলছি, প্রথম অধিবেশন ছিল ভোর ছয়টায়। আর সময়টাও ছিল বছরের এমন অংশে, যখন ফজরের নামাজের ওয়াক্ত তুলনামূলক দেরি করে হয়। সোয়া ছয়টার সময় ফজরের নামাজ শেষ করেই আমি সম্মেলনের উদ্দেশে রওনা হলাম।

পথচলার সময় আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে বিশাল হলরুমটিতে প্রথম অধিবেশন আয়োজন করা হয়েছে, আমি তা সম্পূর্ণ দর্শকশূন্য পাব। এত ভোরে কে-ই বা তাত্ত্বিক আলোচনামূলক একটি সেমিনারে উপস্থিত হবে!

নির্ধারিত হলরুমে পৌঁছে আমি এমন বিস্ময়কর এক দৃশ্যের মুখোমুখি হলাম, যা আমার কল্পনাতেও ছিল না! পুরো হলরুম লোকে লোকারণ্য! হলরুমটিতে প্রায় তিন হাজার লোকের স্থান সংকুলান হয়। আমি অতি কষ্টে কোনোক্রমে শেষ সারিতে জায়গা পেলাম। আসনে বসে আমি আলোচকদের আলোচনা শুনছিলাম আর বিস্ময়চিত্তে ভাবছিলাম, পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুসারী এই লোকগুলো কীভাবে এই পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের জীবনকে খাপ খাইয়ে নিল?! কীভাবে তারা কোনো প্রকার বাধ্যবাধকতা না থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক ও তাত্ত্বিক আলোচনামূলক একটি সেমিনারে ভোর ছয়টায় উপস্থিত হতে পারল?! আর কেন-ই বা অনেক মুসলমান ঠিক একই সময়ের ঐচ্ছিক নয় বরং বাধ্যতামূলক ফজরের নামাজের বিধানের সঙ্গে নিজেদের জীবনকে খাপ খাওয়াতে পারে না?!

যেদিন মুসলমানরা এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে, ইনশাআল্লাহ, সেদিন তারা পুনরায় পৃথিবীর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভ করতে পারবে!

[দৃশ্যপট তিন]

অত্যন্ত নাটকীয় ও মর্মস্পর্শী এক অভিজ্ঞতা!

আমেরিকা সফরে আমি প্রতিদিনই ফজরের নামাজ আদায় করতে যাওয়ার পথে আমেরিকান অনেক নারী-পুরুষকে সড়কে দেখতে পেতাম। প্রিয় পাঠক, আমি 'যাওয়ার পথে' বলেছি; 'ফেরার পথে' নয়! অর্থাৎ তারা ফজরের নামাজের নির্ধারিত সময়েরও পূর্বে তাদের জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ কোনো উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে শয্যাত্যাগ করত।

কী সেই অতি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য, যার কারণে আমেরিকান নারী-পুরুষরা ভোর পাঁচটারও পূর্বে জেগে উঠত; তারপর প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে নগরীর সড়কগুলোতে বেরিয়ে পড়ত?

এ সময় তারা বের হতো তাদের পোষা কুকুরগুলোকে নিয়ে ভোরের নির্মল বায়ুতে প্রাতঃভ্রমণ করতে!

আমেরিকার অনেক নাগরিক ভোর সাড়ে চারটার দিকে শয্যাত্যাগ করে। দীর্ঘক্ষণ বাড়িতে আবদ্ধ থাকা পোষা কুকুরটির জন্য তাদের বড় মায়া হয়! পোষা কুকুরটি যেন ভোরের নির্মল ও পরিচ্ছন্ন বায়ু সেবন করতে পারে, এ উদ্দেশ্যে তারা আরামের ঘুম হারাম করে প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ে।

প্রিয় পাঠক, আশা করি, আপনি এই 'জটিল' অঙ্কটির সমাধান করে দেবেন। একজন আমেরিকান নারী বা পুরুষ; হয়তো খ্রিষ্টান বা ইহুদি কিংবা ধর্মদ্রোহী, সে যদি তার পোষা কুকুরের জন্য অতি ভোরে শয্যাত্যাগ করতে পারে; তাহলে কিছু মুসলমান, কিংবা অনেক মুসলমান; বরং বলতে পারেন, অধিকাংশ মুসলমান মহান আল্লাহ তাআলার জন্য কেন শয্যাত্যাগ করতে পারে না?!

আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, বলুন, এ সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে?!

কীভাবে একটি কুকুরের প্রতি ভালোবাসা তার মালিককে জাগিয়ে তুলতে পারে?! আর কীভাবে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা বান্দাকে জাগিয়ে তুলতে পারে না?!

দৃশ্যপট-তিনটিকে যদি কেবল সাধারণ ঘটনা হিসেবেই বিবেচনা করেন, তাহলে ভুল করবেন। এগুলো থেকে আমরা এ শিক্ষা নিতে পারি যে,

নিঃসন্দেহে শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য শয্যাত্যাগের প্রতিকূল নয়; ফজরের সময় ঘুমিয়ে থাকা এসব লোকের মানসিক সামর্থ্যই বরং শয্যাত্যাগের অন্তরায়! আল্লাহ আমাদের সকলকে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা দান করুন।

তিন.

পশ্চিমা সমাজের কথা রাখুন; আসুন, একান্ত নিজেদের পরিবেশে কিছুক্ষণ বিচরণ করি!

[দৃশ্যপট এক]

আপনি চট্টগ্রাম, সিলেট, দিল্লি বা কলকাতা ভ্রমণে যাচ্ছেন। ট্রেনে বা বিমানে সফর। আপনার যাত্রার নির্ধারিত সময় ভোর পাঁচটায়।

প্রশ্ন হলো, আপনার দৈহিক সামর্থ্য কি এত ভোরে নির্ধারিত সময়ে রেলস্টেশনে বা বিমানবন্দরে পৌঁছার অনুমতি দেয়?! এত ভোরে রেল-স্টেশনে বা বিমানবন্দরে পৌঁছা কি সম্ভব, না সাধ্যাতীত?!

[দৃশ্যপট দুই]

বাসস্থান থেকে অনেকটা দূরে আপনার কর্মস্থল। কর্মক্ষেত্রে কাজ শুরু হয়ে যায় সকাল সাতটায়। তাই কমপক্ষে ভোর পাঁচটায় শয্যাত্যাগ করতে না পারলে আপনার পক্ষে যথাসময়ে কর্মস্থলে পৌঁছা সম্ভব নয়।

আপনি কী করেন? কর্মক্ষেত্রে ঠিকমতো পৌঁছুতে খুব ভোরে ফজরের সময় বা তারও পূর্বে জেগে ওঠেন, না-কি প্রতিদিন দেরি করে কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে কৈফিয়ত পেশ করেন যে, আমার পরিবেশ-পরিস্থিতি ও আমার দুর্বল শারীরিক সামর্থ্য এত ভোরে শয্যাত্যাগের অনুমতি দেয় না?!

আমরা আমাদের মানুষ-কর্তার কাছে কৈফিয়ত পেশ করতে পারি না। তাহলে কীভাবে প্রতিদিন সেই মহান পালনকর্তার দরবারে কৈফিয়ত পেশ করে যাচ্ছি, যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন আমাদের সকল ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকেও?!

[দৃশ্যপট তিন]

একটি অনুমাননির্ভর কাল্পনিক দৃশ্য।

মনে করুন, আপনার এলাকার জনৈক বিত্তশালী ব্যক্তি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আপনি যদি প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় তার সঙ্গে দেখা করেন, তিনি আপনাকে প্রতিবার এক হাজার টাকা প্রদান করবেন।

আপনি প্রতিদিন যথাসময়ে তার কাছে যাবেন? না-কি এই কারণ দর্শাবেন যে, 'আমি দেরি করে ঘুমাই কিংবা আমার সকালে কাজ আছে; তাই আপনার সঙ্গে এ সময় সাক্ষাৎ করা আমার পক্ষে অসম্ভব'?

মনে করুন, বাস্তবে এমন একটি প্রস্তাব পাওয়ার পর আপনি তার কাছে নিয়মিত গিয়েছেন এবং প্রতিদিন এক হাজার টাকা করে নিয়ে এসেছেন। এভাবে পুরো বছর প্রতিদিন ভোরে তার সঙ্গে দেখা করায় আপনি লাভ করেছেন তিন লক্ষ পয়ষট্টি হাজার টাকা।

এবার কল্পনা করুন, বছর শেষে আপনার মৃত্যু হলো। হতেই তো পারে, তাই না? মৃত্যু বছরের শেষে কেন, বছর শেষ হওয়ার পূর্বেও আসতে পারে। চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণের জন্য কল্পনা করুন, আপনাকে লাশের খাটিয়ায় করে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

নিজেকে এমন পরিস্থিতিতে কল্পনা করে এবার পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে নিচের প্রশ্নটির উত্তর দিন।

কবরে যাওয়ার সময় আপনার সঙ্গে থাকবে তিন লক্ষ পয়ষট্টি হাজার টাকা; কিন্তু এক ওয়াক্ত ফজরের নামাজও নয়, অথবা আপনার সঙ্গে থাকবে তিনশ পয়ষট্টি দিনের ফজরের নামাজ; কিন্তু এক টাকাও নয়। কোনটি আপনার পছন্দ? কোনটি আপনি চান?

সত্যি করে বলুন তো!

পরকালে কোনটি আপনার কাজে লাগবে এবং কোন সম্পদটি বাকি থাকবে? তিনশ পয়ষট্টি ফজরের নামাজ, না-কি তিন লক্ষ পয়ষট্টি হাজার টাকা?

কত মানুষ দিন-রাত অর্থ-সম্পদ সঞ্চয়ের পেছনে ব্যতিব্যস্ত, অথচ নেক আমল সঞ্চয়ের কোনো ফিকির নেই; এর কী ব্যাখ্যা আপনি করবেন?

তাদের কি মৃত্যু নিয়ে কোনো দ্বিধা-সংশয় আছে? পরকালের পুনরুজ্জীবন নিয়ে তারা সন্দেহগ্রস্ত? না-কি তাদের সন্দেহ স্বয়ং স্রষ্টাকে নিয়েই?!

যদি এসব বিষয়ে তাদের সন্দেহ-সংশয় না-ই থাকে, তাহলে মৃত্যুর আকস্মিক আগমনের বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও অনেক মুসলমানের মৃত্যুর প্রতি অবজ্ঞার কী ব্যাখ্যা আপনি করবেন? আল্লাহ প্রতিমুহূর্ত আমাকে দেখছেন, আমার সবকিছু আল্লাহ তাআলার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে—এই বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও তারা যে আল্লাহর বিধানের প্রতি অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করছে, তার ব্যাখ্যা-ই বা আপনি কীভাবে করবেন?

এসব প্রশ্ন আমার চিন্তা ও মস্তিষ্ককে হতবুদ্ধি করে দেয়!

ফজরের নামাজের জন্য আমার যেসব মুসলমান ভাই-বোনেরা জাগতে পারেন না, তারা কি দয়া করে আমাকে এসব প্রশ্নের উত্তর দেবেন?!

[দৃশ্যপট চার]

আরেকটি অনুমাননির্ভর দৃশ্য।

ভোর চারটা বাজে। আপনি গভীর ঘুমে অচেতন। হঠাৎ আপনার স্ত্রী বা মা চিৎকার করতে লাগলেন, 'জলদি ওঠো; পাশের বাড়িতে আগুন লেগেছে!'

সত্যি করে বলুন তো, আপনি কি লাফিয়ে বিছানা ছাড়বেন এবং বাইরের পোশাক গায়ে জড়াবেন, না কোনোমতে রাতের পোশাকেই ঘরের অন্যান্য পুরুষ সদস্যদের নিয়ে আগুন নেভাতে ছুটবেন? না-কি আপনার স্ত্রী বা মাকে বলবেন, 'প্লিজ! আমাকে একটু ঘুমাতে দাও; আমি অনেক ক্লান্ত, রাতে অনেক দেরিতে ঘুমিয়েছি, সকালে অনেক কাজ আছে। চিন্তা করো না, আল্লাহর হুকুমে আগুন নিজে নিজেই নিভে যাবে'?!

সত্যি করে বলুন!

কোনটি বেশি ভয়াবহ? পাশের বাড়ির আগুন, না-কি জাহান্নামের লেলিহান অগ্নিশিখা?

কোনটি অধিক যন্ত্রণাদায়ক? পৃথিবীর আগুন, না-কি পরকালের অগ্নিকুণ্ড?

আমরা প্রত্যেকে জানি—পরকাল, জান্নাত-জাহান্নাম সবই সত্য; জাহান্নামের আগুন অনির্বাণ ও বাস্তব সত্য। তারপরও কেন এই আলস্য ও শৈথিল্য? কেন

দুনিয়ার অতি তুচ্ছ আগুনের প্রতি এত ভয় আর পরকালের আগুনের প্রতি এতটা নির্ভয়?!

জাহান্নামের আগুন পৃথিবীর আগুনের চেয়ে বহু গুণ উত্তপ্ত!

হজরত আবু হোরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ»

তোমাদের এ আগুন, যা আদম সন্তানগণ প্রজ্বলিত করে, তা জাহান্নামের আগুনের তাপমাত্রার সত্তর ভাগের এক ভাগ।

সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, 'আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর কসম! এই (স্বল্পমাত্রার) আগুন-ই তো শাস্তি হিসেবে যথেষ্ট ছিল!' নবীজি ইরশাদ করলেন—

«فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا، كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا»

(তবুও) সে আগুনকে এ আগুনের তুলনায় উনসত্তর গুণ বেশি তাপমাত্রাসম্পন্ন করা হয়েছে। প্রত্যেক গুণ তার (দুনিয়ার আগুনের) তাপের সমমানের।[১২]

হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. বর্ণনা করেন, নবীজি ইরশাদ করেছেন—

«يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا»

জাহান্নামকে যখন উপস্থিত করা হবে, তখন তাতে সত্তর হাজার লাগাম যুক্ত থাকবে। প্রতিটি লাগামের সঙ্গে থাকবে সত্তর হাজার ফিরেশতা। তারা তা টেনে নিয়ে যাবে।[১৩]

---

১২. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং-৩২৬৫ ও *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং-২৮৪৩।

১৩. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং-২৮৪২।

হজরত আবু হোরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

«أُوْقِدَ عَلَى النَّارِ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى احْمَرَّتْ، ثُمَّ أُوْقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى ابْيَضَّتْ، ثُمَّ أُوْقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى اسْوَدَّتْ، فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ»

জাহান্নামের আগুন এক হাজার বছর প্রজ্বলিত করা হয়। ফলে তা লাল বর্ণ ধারণ করে। তারপর আরও এক হাজার বছর জ্বালানো হয়। তখন তা সাদা রং ধারণ করে। তারপর আরও এক হাজার বছর জ্বালানো হয়। তখন তা কালো বর্ণ ধারণ করে। সুতরাং এখন তা অন্ধকার ঘন কৃষ্ণ বর্ণের হয়ে আছে।[১৪]

সুনানে ইবনে মাজাহ-এর এক বর্ণনায় আছে—'এখন তা অন্ধকার রাতের ন্যায় হয়ে আছে।'[১৫]

ফজরের নামাজ জাহান্নাম হতে মুক্তির পরোয়ানা!

আমার দ্বীনি ভাই-বোন, ভালো করে জেনে রাখুন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজের প্রতি অনুরাগী ও যত্নশীল হবে, জাহান্নামের লেলিহান অগ্নিশিখা তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নাম হতে নিষ্কৃতি দান করবেন এবং তার জন্য পরকালের আজাব থেকে মুক্তির পরোয়ানা লিখে দেবেন!

নিম্নের হাদিসটি পাঠ করুন এবং হৃদয়ে ধারণ করুন।

হজরত উমারা বিন রুআইবা রাযি. বর্ণনা করেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—

«لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا»

যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে (রাবি বলেন, অর্থাৎ ফজর ও আছর) নামাজ আদায় করবে, সে কক্ষনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।[১৬]

---

১৪. জামে তিরমিজি, হাদিস নং-২৫৯১।

আমার বিশ্বাস—শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য ও মানবিক সক্ষমতা সম্পর্কে এই বিস্তারিত আলোচনা পাঠ করার পর কেউ-ই এ কথা বলবেন না যে, আমার পক্ষে ফজরের সময় ঘুম থেকে ওঠা অসাধ্য ও অসম্ভব। প্রকৃত বিষয় হলো নিয়ত ও সদিচ্ছা; আপনি চান, না-কি চান না?!

প্রিয় পাঠক, সাবধান হোন। জীবনের অতি মূল্যবান অনেকগুলো দিন-মাস ও বছর গত হয়ে যাওয়ার পর যদি আপনি অনুধাবন করেন যে, জীবনের অতি মূল্যবান কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে; এরপর আপনি তাওবা করে সঠিক পথে ফিরেও আসেন, আর আল্লাহ আপনাকে তারপর দীর্ঘ জীবন দানও করেন, তবুও কি অতিবাহিত দিনগুলো ফিরে পাবেন? ফিরে পাবেন বিগত জীবনের ফজরের নামাজগুলো?

জীবনের এমন কাল আসার পূর্বেই সতর্ক হোন, যখন আপনি মসজিদে যেতে চাইবেন; কিন্তু শারীরিক দুর্বলতা, অসুস্থতা কিংবা মৃত্যু আপনাকে মসজিদে যেতে দেবে না। সর্বদা স্মরণ রাখুন হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. বর্ণিত প্রিয় নবীজির এই শাশ্বত হাদিস—

«اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ»

পাঁচ বিষয়ের (আগমনের) পূর্বে পাঁচ বিষয়কে গনিমত মনে করো। বার্ধক্যের জরাগ্রস্ত অবস্থার পূর্বে তোমার যৌবনকে, অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে, দরিদ্রতার পূর্বে তোমার স্বচ্ছলতাকে, ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসরকে এবং মৃত্যুর পূর্বে তোমার জীবনকে।[১৭]

আল্লাহ তাআলা আমাকে, আপনাকে, আমাদের সকলকে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অনুযায়ী চলার তাওফিক দান করুন।

* * *

---

[১৬]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং-৬৩৪।

[১৭]. আবু আবদুল্লাহ আলহাকিম, মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস নং-৭৮৪৬।

ফজরের নামাজ
অনন্য ও ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এক নামাজ!

প্রিয় পাঠক, এটি আমার ব্যক্তিগত গবেষণা বা মতামত নয়! আপনি যদি তাদাব্বুর ও গভীর মনোনিবেশ সহকারে আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করেন, নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করেন প্রিয় নবীজির হাদিসসমূহ, তাহলে সুস্পষ্টভাবে এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবেন যে, ফজরের নামাজ সম্পূর্ণই ব্যতিক্রমী একটি নামাজ! ফজরের ফজিলত ও বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব ও তাৎপর্য সবই অনন্য ও স্বতন্ত্র!

ইসলামে ফজরের নামাজের আছে অনন্য মর্যাদা। ইসলামি শরিয়তে ফজরের নামাজের আছে অনন্যসাধারণ মূল্য ও মূল্যায়ন। এ বিষয়ক আয়াত ও হাদিসসমূহ পাঠ করলে বাস্তবেই আপনি ফজরের নামাজের কথা আলাদা করে ভাবতে বাধ্য হবেন। আপনি উদ্বুদ্ধ হবেন ফজরের নামাজের প্রতি বিশেষ যত্নবান হতে। কুরআন-হাদিসে অনেক স্থানে স্বতন্ত্রভাবে ফজরের নামাজের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং ফজরের নামাজের প্রতি যত্নশীল ব্যক্তির সমুন্নত মর্যাদা তুলে ধরা হয়েছে।

আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন উম্মাহ-দরদি সচেতন ও সতর্ক সংস্কারক। মানবচরিত্রের গতি-প্রকৃতি, মনোবৃত্তির আবেগ-আকর্ষণ সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত ছিলেন। তিনি জানতেন, ফজরের নামাজের ওয়াক্ত তুলনামূলক কঠিন। মুসলমান যদি নফসের অনুগামী হয়ে পড়ে এবং প্রবৃত্তির দাবি অনুযায়ী চলে, তাহলে নফস ও প্রবৃত্তির প্রবঞ্চনায় সে আরামের ঘুমে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে এবং ফরজ নামাজ ছেড়ে দেবে।

﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٓ﴾

মন তো সর্বদা মন্দ কাজেরই আদেশ করে; অবশ্য আমার রব যদি দয়া করেন, সেটা ভিন্ন কথা। [সুরা ইউসুফ : ৫৩]

এ কারণেই নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাজের অত্যুচ্চ ফজিলতসমূহ এবং সুনির্ধারিত বৈশিষ্ট্যসমূহ উম্মতকে জানিয়ে দিয়েছেন। এসব ব্যতিক্রমী ফজিলত ও গুণ-বৈশিষ্ট্য সামগ্রিকভাবে একজন নিষ্ঠাবান মুমিনকে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে ফজরের জামাতে যত্নবান হতে উদ্বুদ্ধ করে এবং পরিস্থিতি ও প্রতিকূলতার শত বাধার মুখেও যেন এক দিনের ফজরের জামাতও ছুটে না যায়, সেজন্য নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করতে পূর্ণ উদ্দীপ্ত করে।

প্রিয় পাঠক, ফজরের নামাজের অনন্য ও ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যসমূহ হতে দশটি বৈশিষ্ট্য আপনার সামনে তুলে ধরছি। মহান আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাকে-আপনাকে ও সকল মুসলমানকে এ আলোচনা দ্বারা উপকৃত করেন।

প্রথম অনন্য বৈশিষ্ট্য
ব্যতিক্রমী ও কল্পনাতীত ফজিলত!

জামাতে ফরজ নামাজ আদায়কারীর জন্য বিভিন্ন হাদিসে নানা ফজিলত ও সাওয়াবের কথা উল্লেখ আছে। ফজরের নামাজ জামাতে আদায়কারী ব্যক্তি সেসব ফজিলত ও সাওয়াব তো লাভ করে-ই; অধিকন্তু সে কেবল ফজরের নামাজের জন্য সুনির্ধারিত অতিরিক্ত ফজিলত ও সাওয়াবসমূহও লাভ করে থাকে।

প্রিয় নবীজির ভাষ্যমতে জামাতে নামাজ আদায়কারীকে এক নামাজে পঁচিশ বা সাতাশ নামাজের সাওয়াব দান করা হয়, প্রভূত সাওয়াব লেখা হয়, কৃত গুনাহ মোচন করা হয় এবং মর্যাদা বুলন্দ করা হয়। ফিরেশতাগণ জামাতে নামাজ আদায়কারীর জন্য কল্যাণের দোয়া করে। এ ছাড়াও সাধারণভাবে যেকোনো নামাজ জামাতে আদায়কারীর জন্য আরও অনেক ফজিলত রয়েছে।

তবে এক্ষেত্রে ফজরের নামাজের আছে অনন্য কিছু ফজিলত ও সাওয়াব, যা অন্য কোনো নামাজের নেই। যেমন,

[প্রথম ফজিলত]
সারা রাত বিনিদ্র ইবাদতের সাওয়াব!

ইসলামের তৃতীয় খলিফা ও বিশিষ্ট সাহাবি হজরত উসমান বিন আফফান রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

«مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ»

যে ব্যক্তি এশার নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করল, সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত নামাজ পড়ল। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামাজও জামাতের সঙ্গে আদায় করল(১৮), সে যেন সারা রাত জেগে নামাজ পড়ল।(১৯)

---

১৮. অর্থাৎ এশা ও ফজর উভয়টিই জামাতে পড়ল, যেমনটি আবু দাউদ ও তিরমিজি শরিফের বর্ণনায় সুস্পষ্ট শব্দে এসেছে।

প্রিয় পাঠক, সারা রাত জেগে নামাজ আদায়! আপনি পারবেন বছরের প্রতিটি দিন বিনিদ্র রজনী নামাজে কাটিয়ে দিতে?!

আপনি যদি ফজর ও এশার নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করে থাকেন, তাহলে বিশ্বাস রাখুন, আল্লাহ তাআলা আপন দয়া ও অনুগ্রহে আপনাকে সারা রাত নামাজ আদায়ের সাওয়াব দান করেছেন। নিঃসন্দেহে কিয়ামুল লাইল ও রাত জেগে নামাজের ফজিলত ও মর্যাদা অনেক অনেক বেশি; কিন্তু ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করার ফজিলত তার চেয়েও বেশি।

যদি ফজরের নামাজ জামাতে আদায়ের এ ফজিলত আপনি যথার্থভাবে উপলব্ধি করে থাকেন, তাহলে অনুগ্রহ করে আমাকে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন, যা আমি ইতিপূর্বে রমজানের সাতাশ তারিখের রাতে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায়ের জন্য জড়ো হওয়া একদল মুসল্লিকে করেছিলাম। আমার সেসব ভাইয়েরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য রাতের নির্জন প্রহরে দীর্ঘ সময় দণ্ডায়মান ছিলেন এবং এই মোবারক রাতের তাহাজ্জুদের ফজিলত অর্জনের আশায় সর্বোচ্চ সচেষ্ট ছিলেন।

আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,

আপনারা জানেন, পুরো কদরের রাত নফল নামাজ আদায় করা বেশি উত্তম, না-কি শাওয়াল, সফর, রজব বা রমজান ছাড়া অন্য যেকোনো মাসে ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করা বেশি উত্তম?!

কাল কিয়ামতের ময়দানে এ দুটি আমলের মধ্যে কোনটি আমলনামার পাল্লায় অধিক ভারী হবে?

কোনটি ছুটে গেলে আপনার হৃদয়ে যন্ত্রণা ও অনুতাপ বেশি হয়?

কোনটি ছুটে গেলে আপনাকে আল্লাহ পাকের দরবারে বেশি তিরস্কৃত হতে হবে?

প্রিয় মুসলিম ভাই-বোন, আমরা কি কেবল আল্লাহর জন্যই নামাজ পড়ি না? কদরের রাতে আমরা কি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা নামাজে দণ্ডায়মান থাকি না?!

আমরা যখন জানতে পারলাম যে, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত ফরজসমূহ যথাসময়ে শরিয়ত-নির্ধারিত পদ্ধতিতে আল্লাহ তাআলার কাম্য স্থানে আদায় করা ব্যতীত তার সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব নয়, তাহলে কেন আমরা এমন বিষয়কে অগ্রবর্তী বিবেচনা করছি, আল্লাহ তাআলা যাকে পশ্চাতে রেখেছেন? আর এমন বিষয়কে কেন পশ্চাতে বিবেচনা করছি, আল্লাহ তাআলা যাকে অগ্রবর্তী করেছেন?!

আল্লাহ মাফ করুন! আমার উদ্দেশ্য মোটেও লাইলাতুল কদরের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য হ্রাস করা নয়। নিঃসন্দেহে লাইলাতুল কদর বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ রজনী, নিঃসন্দেহে কদরের রাতের ইবাদত হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে, শেষ পর্যন্ত তা নফল ইবাদত-ই। কস্মিনকালেও তার মর্যাদা ও সাওয়াব ফরজের ঊর্ধ্বে নয়।

সুতরাং এটা কি আপনার জন্য সঠিক হবে যে, আপনি লাইলাতুল কদরের দিবসে মাগরিব বা এশার নামাজ ছেড়ে দেবেন; এরপর পুরো রাত নির্ঘুম নামাজে কাটিয়ে দেবেন?! নিশ্চিত করেই বলা যায়, এটা সঠিক কাজ হবে না।

আপনি কি পারবেন জোহরের নামাজের ওয়াক্তে বিশ রাকাত নফল নামাজ পড়তে, এরপর জোহরের চার রাকাত ফরজ নামাজই ছেড়ে দিতে?!

সারা বছর আপনি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখলেন, তারপর মাহে রমজানে কোনো প্রকার ওজর ছাড়াই ইচ্ছা করে রোজা ভঙ্গ করলেন, বলুন, এ নফল রোজা আপনার কোনো উপকারে আসবে?

যদি এই সকল প্রশ্নের উত্তর হয় 'না', তাহলে কীভাবে মুসলমান ফজরের নামাজ ছেড়ে দেওয়াকে মেনে নিয়েছে?

জোহর বা আছরের নামাজ, রমজানের রোজা এবং ফরজ জাকাতের মতো ফজরের নামাজও কি শরিয়তের ফরজ বিধান নয়?

আল্লাহ তাআলা তো আমাদেরকে এ শিক্ষাই দিয়েছেন যে, সাধারণভাবে সকল ফরজ সকল নফলের তুলনায় অগ্রবর্তী।

হজরত আবু হোরায়রা রাযি. নববি মোবারক জবানে বর্ণিত এক হাদিসে কুদসিতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

«وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ»

আমার বান্দার ওপর আমি যা ফরজ করেছি, তার চাইতে আমার কাছে অধিক প্রিয় কোনো ইবাদত দ্বারা সে আমার নৈকট্য লাভ করতে পারবে না। আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে; এমনকি অবশেষে আমি তাকে আমার প্রিয়পাত্র বানিয়ে নিই।[২০]

তাহলে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, লাইলাতুল কদরের পুরো রাত ইবাদত করা নফল ইবাদত আর বছরের যেকোনো দিন ফজরের নামাজ আদায় করা ফরজ ইবাদত। এটি তো দ্বীনের একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়।

প্রিয় পাঠক, এ সবকিছুই যখন আপনার জানা আছে, তাহলে আল্লাহর শপথ দিয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, বলুন তো, কেন আমরা ও আমাদের সমাজ লাইলাতুল কদরে উন্মাদের মতো মসজিদে নামাজের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ি, প্রতিটি মসজিদ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়; বরং মসজিদগুলোর পাশের রাস্তা-ঘাটও মুসল্লিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তারপর রমজান শেষ হতেই আশ্চর্যজনকভাবে এই বিশাল জমায়েত মসজিদে ফজরের নামাজে অনুপস্থিত থাকে?!

কেন আমার প্রিয় ভাই?!

কেন দ্বীনের সঠিক মর্ম ও ফরজ বিধানের প্রতি এই চরম অবহেলা?

পরিতাপের বিষয়, মানুষ অপ্রচলিত নতুন বিষয়ে দৃষ্টিভ্রমের শিকার হয় এবং অতিরিক্ত আগ্রহ দেখায়। আর যে কাজ সে সর্বদা করে বা দেখে অভ্যস্ত, তার প্রতি আশ্চর্য নির্লিপ্ততা প্রকাশ করে। লাইলাতুল কদরের নামাজ তো বছরে একবার আসে; কিন্তু ফজরের নামাজ আসে প্রতিদিন ভোরে। তাই মানুষ ফজরের নামাজের মূল্য সম্পর্কে অনুভূতি হারিয়ে ফেলছে আর কদরের রজনীর নামাজের জন্য পূর্ণ উদ্যম ও গুরুত্বের সঙ্গে আকৃষ্ট হচ্ছে!

হে আমার দ্বীনি ভাই, আমি আপনাকে একটি বাস্তব সত্য বলছি—

লাইলাতুল কদর বান্দার হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়া কোনো সম্পদ নয়!

যারা ফরজ আদায়ে যত্নবান, লাইলাতুল কদর কেবল তাদের জন্যই আল্লাহপ্রদত্ত এক সুমহান উপহার!

যারা সারা বছর আমল ও ইবাদতে প্রচেষ্টারত, লাইলাতুল কদর কেবল তাদের জন্য এক অনুপম দান!

ইবাদত তো কোনো জুয়া খেলা নয়!

এটা কি যৌক্তিক যে, একজন ব্যক্তি বছরে দু-চার দিন আল্লাহর ইবাদত করেই ওই ব্যক্তির সমকক্ষ হয়ে যাবে, যিনি আল্লাহর ইবাদত করেন সারা বছর?

এটাও কি যুক্তিসঙ্গত যে, যে ব্যক্তি প্রতিদিন ফজরের ওয়াক্তে আল্লাহর ফরজ বিধান পালন করার জন্য জাগ্রত হয়, তার ন্যায় আল্লাহ তাদেরকেও মাফ করে দেবেন, যারা সারা বছরে মাত্র আট-দশদিন আল্লাহর জন্য বিনিদ্র রজনী কাটায়?

আমার প্রিয় ভাই, আল্লাহ তাআলা তো অণু-পরমাণু ও তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়েরও হিসাব নেবেন।

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ ۚ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ﴾

> অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয় এবং তারাও নয়, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে এবং যারা অসৎকর্মশীল। (কিন্তু) তোমরা খুব কমই অনুধাবন করো। [সুরা মুমিন : ৫৮]

আমাদের দ্বীন তো সুস্পষ্ট ও সুশৃঙ্খল এক দ্বীন। এ দ্বীনের অপরিহার্য দাবি হলো—মানুষ নফল নামাজের তুলনায়, এমনকি তা কদরের রাতের হোক না কেন, জামাতে ফরজ নামাজ আদায়ের জন্য অধিক পাগলপারা হয়ে প্রতিযোগিতা করে মসজিদে ছুটে যাবে।

এটি আমার কথা নয়; স্বয়ং নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা এটি।

হজরত আবু হোরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, নবীজি ইরশাদ করেছেন—

«لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا»

আজানে ও প্রথম কাতারে কী (ফজিলত) রয়েছে, তা যদি লোকেরা জানত, আর লটারির মাধ্যমে নির্বাচন ব্যতীত এ সুযোগ লাভ করা যদি সম্ভব না হতো, তাহলে অবশ্যই তারা (প্রথম কাতারে দাঁড়াতে আগ্রহীদের সংখ্যা অধিক হওয়ায়) লটারির মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত নিত। নামাজের জন্য দ্রুত গমনে কী (ফজিলত) রয়েছে, যদি তারা জানত, তাহলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করত। আর এশা ও ফজরের নামাজ (জামাতে) আদায়ে কী ফজিলত রয়েছে, তা যদি তারা জানত, তাহলে নিঃসন্দেহে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও (মসজিদে) উপস্থিত হতো।[২১]

কেউ হয়তো ভাবতে পারেন যে, লাইলাতুল কদরে তো দোয়া কবুল হয়। এ কারণেই মানুষ লাইলাতুল কদরের ইবাদতের প্রতি অধিক আগ্রহী।

আমি তাকে উত্তর দেবো, আপনি সত্য বলেছেন; লাইলাতুল কদরে দোয়া কবুল হয় আর যেমন পূর্বেও বলে এসেছি যে, লাইলাতুল কদর পুরো বছরের শ্রেষ্ঠতম রজনী। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের সবাইকে লাইলাতুল কদর নসিব করুন। কিন্তু আপনার কাছে আমার জিজ্ঞাসা—পুরো বছরে এটিই কি দোয়া কবুলের একমাত্র সময়?!

আল্লাহ তাআলা তো আপনার জন্য আপনার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই একই সুযোগ রেখেছেন!

স্বয়ং মহান আল্লাহ-ই তো ইরশাদ করেছেন—

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

---

২১. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং-৬১৫।

তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, আমাকে ডাকো; আমি তোমাদের দোয়া কবুল করব। [সুরা মুমিন : ৬০]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন—

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾

(হে নবী!) আমার বান্দাগণ যখন আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তখন (আপনি তাদেরকে বলুন,) আমি এত নিকটবর্তী যে, কেউ যখন আমাকে ডাকে, আমি তার ডাক শুনি। [সুরা বাকারা : ১৮৬]

আপনার দায়িত্ব কেবল দোয়া করা; আল্লাহ নিশ্চয়ই আপনার প্রার্থনা কবুল করবেন। আপনার দায়িত্ব দোয়া করা যেকোনো সময়, যেকোনো পরিস্থিতিতে এবং সারা জীবন।

যদি আপনি প্রশ্ন করেন—কিন্তু কিছু মোবারক সময় তো এমন আছে, যখন দোয়া করলে কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে? আমি বলব, হ্যাঁ, আপনার কথা সত্য। কিন্তু আপনি চাইলে বছরের প্রতিটি রাতে এই মোবারক সময় লাভ করতে পারেন। অথচ অধিকাংশ সময় আপনি তার প্রতি উদাসীন!

বছরের প্রতিটি রাতে এমন কিছু মুহূর্ত আছে, যখন দোয়া করলে প্রত্যাখ্যাত হতে হয় না। যারা ফজরের নামাজের সামান্য পূর্বে হলেও জেগে ওঠেন, একমাত্র তারাই সেই বিশেষ মুহূর্তগুলোর কথা জানেন!

অত্যন্ত মোবারক ও বরকতপূর্ণ কিছু মুহূর্ত; বরং তা বছরের শ্রেষ্ঠতম মুহূর্তগুলোর অন্তর্ভুক্ত!

হজরত আবু হোরায়রা রাযি. কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে নবীজি ইরশাদ করেছেন—

«يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يَقُوْلُ : مَنْ يَدْعُوْنِيْ؟ فَأَسْتَجِيْبَ لَه، مَنْ يَسْأَلُنِيْ؟ فَأُعْطِيَه، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ؟ فَأَغْفِرَ لَه»

আল্লাহ তাআলা প্রতি রাতে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে

থাকেন, কে আছে এমন, যে আমাকে ডাকবে, আমি ডাকে সাড়া দেবো। কে আছে এমন, যে আমার কাছে চাইবে, আমি তার প্রার্থনা কবুল করব। কে আছে এমন, যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো।[২২]

আমার প্রিয় ভাই-বোন, এরচেয়ে বেশি আর কী চান?!

আল্লাহ তাআলা নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে আপনাকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকেন, 'দোয়া করো; আমি কবুল করব'!

আল্লাহু আকবার! হে আমাদের রব! আপনি কত দয়ালু!

আপনি কত করুণাময়! আপনি কত মহান! আপনি কত কাছে!

প্রতি রাতেই একই আহ্বান! একই অনুগ্রহ-দান!

সুবহানাল্লাহ! কত মহান আমার আল্লাহ! কত পবিত্র তিনি!

আর সেই মোবারক মুহূর্তে দোয়া করার পর আপনি যদি ফজরের নামাজের জন্য মসজিদে চলে আসেন, তাহলে তো আল্লাহ পাকের আরও নিকটে চলে এলেন! আপনার দোয়া কবুলের আশা ও সম্ভাবনা তো আরও বৃদ্ধি পেল! আল্লাহ তাআলা এখন আপনার দোয়া আরও বেশি শ্রবণ করবেন!

হজরত আবু হোরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত এই হাদিসটিও পাঠ করুন—

«أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ»

সিজদার অবস্থায়ই বান্দা তার রবের অধিক নিকটবর্তী হয়ে থাকে। সুতরাং তোমরা (সিজদায়) অধিক পরিমাণে দোয়া করবে।[২৩]

সুতরাং হে মুমিন ভাই আমার, হে মুমিনা বোন আমার, কিছুক্ষণ আত্মসমাহিত হয়ে নিজের সঙ্গে যাপন করুন এবং ভাবুন—যদি ফজরের নামাজে আজর ও সাওয়াব অধিক হয়, যদি ফজরের নামাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অধিক গুরুত্ববহ হয় এবং যদি ফজরের সময়ের দোয়া আল্লাহ পাকের নিকট অধিক কবুলযোগ্য হয়, তাহলে মানুষ কেন ফজরের নামাজ না পড়ে ঘুমিয়ে থাকে?

কেন এই কল্যাণভাণ্ডারের প্রতি এরূপ নিরুদ্বেগ নির্লিপ্ততা?

এসব প্রশ্নের উত্তর জানা প্রয়োজন এবং জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজন!

---

২২. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং-১১৪৫ ও *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং-৭৫৮।

২৩. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং-৪৮২।

[দ্বিতীয় ফজিলত]

কিয়ামতের ঘোর অন্ধকারে কুদরতি নুরপ্রাপ্তি।

কিয়ামতের দিন আলোর স্বাভাবিক ও নিয়মিত উৎসগুলো অদৃশ্য থাকবে; সূর্যকে ভাঁজ করে রাখা হবে, তারকাসমূহ খসে খসে পড়বে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন—

﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ﴾

যখন সূর্যকে ভাঁজ করা হবে এবং যখন নক্ষত্ররাজি খসে খসে পড়বে।

[সুরা তাকভির : ১-২]

কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ প্রচণ্ড অন্ধকারের মধ্যে আপন আপন কবর থেকে উত্থিত হবে।

﴿ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا﴾

স্তরের ওপর স্তরে বিন্যস্ত আঁধারপুঞ্জ। কেউ যখন নিজ হাত বের করে, তাও দেখতে পায় না। [সুরা নুর : ৪০]

কিয়ামতের ময়দানে পথচলার জন্য সকল মানুষের আলোর প্রয়োজন হবে। বিশাল জমায়েত তখন একসঙ্গে পথ চলবে।

আলোর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে পুলসিরাত পাড়ি দেওয়ার সময়। পুলসিরাতের বিবরণ তো বড় ভীতিপ্রদ! আল্লাহ যাদের জন্য চাইবেন, একমাত্র তারাই সক্ষম হবে পুলসিরাত পাড়ি দিতে।

হজরত আবু হোরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পুলসিরাত পাড়ি দেওয়ার সময় মানুষের অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে) ইরশাদ করেছেন—

«فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ»

আর তোমাদের প্রথম দলটি বিদ্যুৎগতিতে পার হয়ে যাবে।

সাহাবি (আবু হোরায়রা রাযি.) বলেন, আমি বললাম, আপনার জন্য আমার মাতা-পিতা উৎসর্গ হোক। আমাকে বলে দিন, 'বিদ্যুৎগতিতে' কথাটির অর্থ কী?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন,

«أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ؟»

তুমি কি কখনো আকাশের বিদ্যুৎচমক দেখনি যে, কীভাবে চোখের পলকে এখান থেকে সেখানে চলে যায়, আবার ফিরে আসে?

তারপর নবীজি বললেন,

«ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ وَشَدِّ الرِّجَالِ، تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ: رَبِّ! سَلِّمْ، سَلِّمْ، حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ، حَتَّى يَجِيْءَ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا»

এর পরবর্তী দলগুলি যথাক্রমে বায়ুর বেগে, পাখির গতিতে এবং মানুষের দৌড়ের গতিতে পার হয়ে যাবে। প্রত্যেকেই তার আমল হিসেবে তা অতিক্রম করবে। আর তোমাদের নবী তখন পুলসিরাতের ওপর দাঁড়িয়ে এ দোয়া করতে থাকবেন, 'হে আল্লাহ, এদেরকে নিরাপদে পৌঁছিয়ে দিন; এদেরকে নিরাপদে পৌঁছিয়ে দিন; এদেরকে নিরাপদে পৌঁছিয়ে দিন।' এভাবে মানুষের আমল মানুষকে চলতে অক্ষম করে দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা তা অতিক্রম করতে থাকবে। শেষে এক ব্যক্তিকে দেখা যাবে, সে নিতম্বের ওপর ভর করে পথ অতিক্রম করছে।

নবীজি এরপর বললেন,

«وَفِي حَافَتَيِ الصِّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَأْمُوْرَةٌ بِأَخْذِ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ، فَمَخْدُوْشٌ نَاجٍ، وَمَكْدُوْسٌ فِي النَّارِ»

পুলসিরাতের উভয় পার্শ্বে ঝোলানো থাকবে কাঁটাযুক্ত লৌহ শলাকা। কাঁটাগুলো আল্লাহ তাআলার নির্দেশক্রমে চিহ্নিত পাপীদেরকে পাকড়াও করবে। তন্মধ্যে কাউকে তো ক্ষত-বিক্ষত করেই ছেড়ে দেবে, সে নাজাত পাবে। আর কতক আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে জাহান্নামের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে।

হাদিস বর্ণনা শেষে সাহাবি হজরত আবু হোরায়রা রাযি. বলেন,

«وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ! إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعُوْنَ خَرِيْفًا»

শপথ সেই সত্তার, যার হাতে আবু হোরায়রার প্রাণ! জেনে রেখো, জাহান্নামের গভীরতা সত্তর খারিফ (অর্থাৎ সত্তর হাজার বছরের পথতুল্য)![২৪]

ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই কঠিন ও সংকটপূর্ণ দিবসে আল্লাহ তাআলা সকল মুসলমানকে নুর ও কুদরতি আলো দান করবেন। পার্থিব জীবনে যারা মৌখিকভাবে ইসলামের কালিমার স্বীকৃতি দিয়েছে, প্রথমে আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে নুর দান করবেন। কিন্তু যারা ছিল কপট বিশ্বাসী ও মুনাফিক; যারা মুখে ঈমানের দাবি করলেও অন্তরে লালন করত দাবির বিপরীত বিশ্বাস, একটু পরেই তাদের অবস্থা বদলে যাবে। সবাই যখন পুলসিরাতের নিকটবর্তী হবে, আল্লাহ তাআলা তখন কেবল নিষ্ঠাবান মুমিনদের জন্যই আলো রাখবেন আর মুনাফিকদের আলো কেড়ে নেবেন। মুনাফিকরা তখন প্রচণ্ড আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তারা মুমিনদের কাছে গিয়ে আলো প্রার্থনা করবে। মুমিনগণ তাদেরকে পরামর্শ দেবে কিয়ামতের দিন তাদেরকে আল্লাহ তাআলা প্রথম যেখানে আলো দান করেছিলেন, সেখানে ফিরে গিয়ে পুনরায় আলো সংগ্রহ করতে। কিন্তু মুনাফিকরা সেখানে ফিরে গিয়ে কিছুই পাবে না। তখন তারা পুরোপুরি বিফল মনোরথ হয়ে পড়বে।

﴿فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ﴾

তখন তারা আর্তচিৎকার করেছিল; কিন্তু তখন তো মুক্তি পাওয়ার সময়ই ছিল না। [সুরা সোয়াদ : ০৩]

সহিহ মুসলিম শরিফের একাধিক হাদিসে এ সময়কার বিবরণ বিস্তারিত এসেছে। মহান আল্লাহ তাআলাও তার প্রজ্ঞাপূর্ণ গ্রন্থ আল কুরআনের সুরা হাদিদ-এ কিয়ামত দিবসের সেই কঠিন চিত্র অঙ্কন করে ইরশাদ করেছেন—

﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ بِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞ يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ

---

২৪. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-৩২৯।

مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ؕ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ
بَابٌ ؕ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ○ يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ
مَّعَكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ
الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ○ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ
فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ ؕ هِيَ مَوْلٰىكُمْ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿﴾

সেদিন তুমি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে দেখবে, তাদের নুর তাদের সামনে ও তাদের ডান দিকে ধাবিত হচ্ছে (এবং তাদেরকে বলা হবে) তোমাদের জন্য এমন সব উদ্যানের সুসংবাদ, যার নিচে নহর প্রবাহিত থাকবে, যাতে তোমরা সর্বদা থাকবে। এটাই মহা সাফল্য। সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীগণ মুমিনদেরকে বলবে, আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা করো, যাতে তোমাদের নুর থেকে আমরাও কিছুটা আলো গ্রহণ করতে পারি। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা তোমাদের পেছনে ফিরে যাও, তারপর নুর তালাশ করো। তারপর তাদের মাঝখানে স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর। তার মধ্যে থাকবে একটি দরজা, যার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে শাস্তি। তারা মুমিনদেরকে ডেকে বলবে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? মুমিনগণ বলবে, হ্যাঁ, ছিলে বটে; কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদে ফেলেছ। তোমরা অপেক্ষা করছিলে, সন্দেহে নিপতিত ছিলে এবং মিথ্যা আশা তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল, যতক্ষণ না আল্লাহর হুকুম উপস্থিত হলো। আর সেই মহা প্রতারক (শয়তান) তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত করে যাচ্ছিল। সুতরাং আজ তোমাদের থেকেও কোনো মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং তাদের থেকেও না, যারা (প্রকাশ্যে) কুফর অবলম্বন করেছিল। তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম। তা-ই তোমাদের আশ্রয়স্থল এবং তা অতি মন্দ পরিণাম।

[সুরা হাদিদ : ১২-১৫]

প্রিয় পাঠক, কিয়ামতের সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দিবসে মুমিন বান্দাগণ কোথা থেকে সেই কুদরতি নুর লাভ করবে?

পার্থিব জীবনে যেসব আমলের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে নুর ও আলো-দানের প্রতিশ্রুতি ছিল, সেসব নেক আমলের প্রতিদানেই মুমিনরা কিয়ামত-দিবসে নুর লাভ করবে। আর সেসব আমলের মধ্যে অন্যতম হলো 'ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করা'।

হজরত বুরায়দা আসলামি রাযি. বর্ণনা করেন, রাসুলে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

«بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

রাতের অন্ধকারে মসজিদে অধিক যাতায়াতকারীদের কিয়ামত-দিবসের পরিপূর্ণ নুরের সুসংবাদ দাও।[২৫]

আলোচ্য হাদিসে 'অধিক যাতায়াতকারী' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যারা এই নেক আমলে নিয়মিত অভ্যস্ত ছিল। 'অন্ধকারে' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এশা ও ফজরের নামাজে। 'মসজিদে' শব্দটি এ বিষয়ের সুস্পষ্ট দলিল যে, এই নুর কেবল তাদেরকেই দান করা হবে, যারা ফজর ও এশার নামাজ মসজিদে জামাতে আদায়ে যত্নবান থাকে। হাদিসে কেবল জামাতে নামাজের কথা উল্লেখ করা হয়নি; বরং আল্লাহর ঘর মসজিদে নামাজ পড়ার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং হাদিসে সেসব মুসলমান ভাইদের চিন্তাধারাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, যারা ঘরে নিজ স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে জামাতে নামাজ আদায় করে আর মনে করে যে, এতেই ফজিলত নিহিত রয়েছে! তাদের ধারণামতে তারা এর মাধ্যমে পরিবারকেও নামাজে অভ্যস্ত করছেন এবং আপন পরিবারকে জামাতের সাওয়াব লাভের সুযোগ করে দিয়ে তাদের মর্যাদা সমুন্নত করছেন! কিন্তু শরিয়ত ও শরিয়তের বিধি-বিধান প্রণয়নকারী স্বয়ং আল্লাহ তাআলা মুসলিম পুরুষদেরকে মসজিদে নামাজ আদায়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন আর নারীদেরকে আপন ঘরে নামাজ আদায় করলেই সমপরিমাণ সাওয়াব দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বাকি রইল সন্তানদের জামাতে নামাজ পড়তে অভ্যস্ত

---

[২৫]. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং-৭৮১, সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং-৫৬১ ও জামে তিরমিজি, হাদিস নং-২২৩।

করার অনুশীলন, সেটা তো তাদেরকে মসজিদে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া বা ঘরে তাদেরকে নিয়ে নফল নামাজ আদায়ের মাধ্যমেও হতে পারে; এজন্য তো ফরজ নামাজ ঘরে আদায়ের কোনো প্রয়োজন নেই।

যারা নিয়মিত ফজরের নামাজ মসজিদে জামাতে আদায়ের প্রতি যত্নবান থাকে, আলোচ্য হাদিসে তাদেরকে 'পরিপূর্ণ নুর' প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে প্রদত্ত নুর ও আলো কোনো স্থানেই কেড়ে নেওয়া হবে না, পুলসিরাত পাড়ি দেওয়ার সময়ও আলো তাদের সঙ্গে থাকবে; বরং জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত উক্ত নুর তাদের সঙ্গী হয়ে থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য, কিয়ামত দিবসে মুমিনদের প্রদত্ত নুর বিভিন্ন স্তরের হবে। সকল মুমিন একই মানের আলো লাভ করবে না; বরং প্রত্যেকে আপন আপন আমলের মান ও পরিমাণ অনুসারে নুর লাভ করবে। এর মাধ্যমেও ফজরের নামাজের ভূমিকা ও গুরুত্ব সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহ তাআলা ফজরের নামাজের কারণে কিয়ামতের দিন মুমিন বান্দাকে পরিপূর্ণ নুর দান করবেন।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আপন উম্মতের প্রতি পরম দয়ালু ও অনুরাগী। তিনি উম্মতকে একটি বিশেষ দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন এবং পৃথিবী যখন অন্ধকারে ছেয়ে থাকে, তখন ফজরের নামাজে যাওয়ার পথে দোয়াটি পড়ার নির্দেশনা দিয়েছেন।

বিস্ময়কর এক দোয়া! আল্লাহর কাছে নুর ও আলোপ্রাপ্তির দোয়া!

বান্দা আপন রবের কাছে এমন নুর ও কুদরতি আলো প্রার্থনা করবে, যা তার জীবনচলার পথ আলোকিত করবে, তার কবরজগৎকে আলোকিত করবে এবং কিয়ামত দিবসেও তার সঙ্গী হবে!

হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাজের উদ্দেশে বের হওয়ার সময় এই দোয়া পড়তেন—

«اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا، وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا، وَمِنْ أَمَامِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا، وَمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا، اَللّٰهُمَّ أَعْطِنِيْ نُوْرًا»

হে আল্লাহ, আমার অন্তরে নুর দান করুন, আমার জিহ্বায় নুর দান করুন, আমার শ্রবণশক্তিতে নুর দান করুন এবং আমার দৃষ্টিতে নুর দান করুন। আমার পেছনে নুর, আমার সম্মুখে নুর, আমার ওপরে নুর এবং আমার নিচে নুর দান করুন। হে আল্লাহ, আমাকে নুর দান করুন।[২৬]

উল্লিখিত শব্দাবলি মুসলিম শরিফের রেওয়ায়েতে এসেছে। বুখারি শরিফের রেওয়ায়েতে অতিরিক্ত আরও আছে—

«وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا، وَعَنْ يَسَارِيْ نُوْرًا»

আমার ডানদিকে নুর এবং আমার বাম দিকে নুর দান করুন।[২৭]

প্রিয় পাঠক, এই নুরের বদৌলতে কেবল আপনার কবরজগৎ ও পরকালই আলোকিত হবে না; আলোকিত হবে পার্থিব জীবনও!

পার্থিব জীবনে মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে দ্বিধা-সংশয়ের শিকার হয়। তখন সে ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্য, সঠিক-বেঠিক নির্ণয় করতে পারে না। বিশেষত ফিতনার সময় এ ধরনের পরিস্থিতি বেশি হয়। হজরত আবু হোরায়রা রাযি. বর্ণিত এক হাদিসে নবীজি বিষয়টি সুন্দরভাবে চিত্রায়িত করেছেন। নবীজি ইরশাদ করেন—

«بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ»

অন্ধকার রাতের ন্যায় ফিতনা আসার পূর্বেই তোমরা নেক আমলের প্রতি অগ্রসর হও।[২৮]

অন্ধকারাচ্ছন্ন ফিতনার সেই সঙ্গিন মুহূর্তে মুমিনকে সহায়তা করে আল্লাহপ্রদত্ত নুর। ইলাহি নুরের আলোকচ্ছটায় আগামীর পথ তার সামনে সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। সে পথ হারায় না, বিভ্রান্ত হয় না এবং দুর্ভাগ্যের শিকার হয় না। আল্লাহ তাআলা তখন তাকে হিকমত ও প্রজ্ঞা দান করেন এবং যে পথ দুনিয়া ও আখিরাতের বিচারে কল্যাণকর, সেদিকেই তাকে নির্দেশনা দান করেন।

---

২৬. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-৭৬৩।

২৭. সহিহ বুখারি, হাদিস নং-৬৩১৬।

২৮. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-১৮৬।

﴿أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

একটু তো বলো, যে ব্যক্তি ছিল প্রাণহীন, অতঃপর আমি তাকে জীবন দিয়েছি এবং তার জন্য এক আলোর ব্যবস্থা করেছি, যার সাহায্যে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে, সে কি ওই ব্যক্তির মতো হতে পারে, যার অবস্থা এই যে, সে অন্ধকার দ্বারা পরিবেষ্টিত, যা থেকে সে কখনো বের হতে পারবে না? এভাবেই কাফিরদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তারা যা কিছু করছে, তা বড়ই চমৎকার কাজ! [সুরা আনআম : ১২২]

মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের দুনিয়া, কবর ও আখিরাত—জীবনের প্রতিটি স্তরকে তার প্রদত্ত নুরে আলোকিত করে দেন। আল্লাহ তাআলাই যাবতীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক, তিনিই প্রকৃত ক্ষমতাবান।

[তৃতীয় ফজিলত]

জান্নাত লাভের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি!

হজরত আবু মুসা আশআরি রাযি. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

«مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ»

যে ব্যক্তি শান্ত-স্নিগ্ধ দুই সময়ে নামাজ আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২৯]

'শান্ত-স্নিগ্ধ দুই সময়ের সালাত' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফজর ও আছরের নামাজ। এটি দয়াময় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার রাসুলকে প্রদত্ত এক প্রতিশ্রুতি যে, যারা ফজর ও আছরের নামাজ নিয়মিত আদায়ে যত্নবান হবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

জান্নাতই তো মুমিন বান্দার চির আরাধ্য স্বপ্ন, স্বপ্নের চূড়া! জান্নাতই তো প্রকৃত সফলতা ও মহা সাফল্য!

---

২৯. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং-৫৭৪ ও *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং-৬৩৫।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ﴾

অতঃপর যাকেই জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হবে ও জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হবে, সে-ই প্রকৃত অর্থে সফলকাম হবে। আর (জান্নাতের বিপরীতে) এই পার্থিব জীবন তো প্রতারণার উপকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

[সুরা আলে-ইমরান : ১৮৫]

[চতুর্থ ফজিলত]

জান্নাতের চেয়েও মহান নিয়ামত প্রাপ্তি!

প্রিয় পাঠক, আপনি হয়তো বিস্ময়ে হতবাক!

জান্নাত লাভের চেয়ে ঊর্ধ্বের কোনো প্রাপ্তিও কি মুমিন বান্দার জীবনে আছে?! কী সেই মহান নিয়ামত, যার মর্যাদা জান্নাতের চেয়েও বেশি?!

স্বয়ং রাসুলে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে উত্তর দিচ্ছেন—হ্যাঁ, আছে! জান্নাত লাভের চেয়েও মহান এক নিয়ামত আছে! আর তা হলো জান্নাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দিদারলাভে ধন্য হওয়া!

মুমিন বান্দার জন্য আল্লাহপ্রদত্ত সবচেয়ে বড় পুরস্কার!

দিদারে ইলাহির সামনে তো আর সকল দান তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ!

কারা লাভ করবে এই মহান নিয়ামত?

কারা ধন্য হবে দিদারে ইলাহিতে?

উত্তর শুনুন সাহাবি হজরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি.-এর জবানে। তিনি বলেন—আমরা (একদিন) নবীজির দরবারে বসা ছিলাম। হঠাৎ নবীজি পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন—

«إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ، كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ، لَا تُضَامُّوْنَ فِيْ رُؤْيَتِهِ»

শোনো, তোমরা অচিরেই তোমাদের রবকে দেখতে পাবে, যেমন এ চাঁদ তোমরা দেখতে পাচ্ছ। চাঁদ দেখতে তো তোমরা পরস্পরে ভীড়ের চাপে পড়ছ না।

তোমরা আকাশের পূর্ণিমার চাঁদ সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ।)

(অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাকে তোমরা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাবে, যেমন এখন

এরপর নবীজি বললেন—

«فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوْا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوْا»

যদি তোমরা সক্ষম হও, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বের নামাজ আদায়ে পিছপা হয়ো না।[৩০]

অর্থাৎ যারা ফজর ও আছরের নামাজ নিয়মিত আদায়ে যত্নবান হবে, তারাই লাভ করবে এই অত্যুচ্চ নিয়ামত!

প্রিয় পাঠক, ওপরের আলোচনায় আমরা জানতে পারলাম যে, ফজরের নামাজ নিয়মিত মসজিদে জামাতে আদায় করলে জামাতে নামাজ আদায়ের অন্যান্য ব্যাপক ফজিলত তো অর্জিত হবেই; অতিরিক্ত অর্জিত হবে চারটি অত্যুচ্চ ফজিলত।

১. সারা রাত বিনিদ্র নফল ইবাদতের সাওয়াব!

২. কিয়ামতের কঠিন দিবসে কুদরতি নুর প্রাপ্তি!

৩. জান্নাতলাভের সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি!

৪. জান্নাতে আল্লাহপাকের দিদার ও সাক্ষাৎ লাভ!

সুবহানাল্লাহ! এত সব কল্যাণ নিহিত ফজরের নামাজেই!

সুতরাং প্রিয় পাঠক, এত সব কল্যাণের কথা জেনেও ফজরের নামাজের সময় যারা আরামের ঘুমে বিভোর থাকে, তাদের বিষয়ে আপনি কী বলবেন?!

এটা কি চরম বোকামি ও নির্বুদ্ধিতা নয়?!

এটা কি সুস্পষ্ট অলসতা ও উদাসীনতা নয়?!

নিঃসন্দেহে তাই; যেমনটি স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

﴿وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ﴾

বস্তুত আল্লাহ যাকে আলো না দেন, তার নসিবে কোনো আলো নেই।

[সুরা নুর : ৪০]

৩০. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং-৫৫৪।

দ্বিতীয় অনন্য বৈশিষ্ট্য

ফজরের নামাজ কাজা হওয়া মানে শুধুই সাওয়াব খোয়ানো নয়!

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানে আপন বান্দাদেরকে এ মর্মে সতর্ক করেছেন যে, তারা যেন আল্লাহ তাআলার অপরিসীম দয়া ও সুমহান ক্ষমার গুণের দিকে তাকিয়ে প্রবঞ্চিত না হয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ﴾

আল্লাহ তোমাদেরকে নিজ শাস্তি হতে সাবধান করছেন।

[সুরা আলে-ইমরান : ৩০]

তিনি আরও ইরশাদ করেন—

﴿وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِیْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِیْشَةً ضَنْكًا وَّ نَحْشُرُهٗ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ اَعْمٰی﴾

আর যে আমার উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে বড় সংকটময়। আর কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ করে ওঠাব।

[সুরা ত্বহা : ১২৪]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِیْعُ الْعِقَابِ ۖۚ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ﴾

নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তি দানকারী এবং নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালুও বটে।

[সুরা আরাফ : ১৬৭]

এ জাতীয় আয়াতের সংখ্যা অনেক। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলা তো আপন বান্দাদের ওপর জুলুম করেন না; বান্দা নিজেই নিজের ওপর জুলুম করে থাকে।

ইমাম মুসলিম রহ. হজরত আবু যর রাযি.-এর সূত্রে নববি জবানে বর্ণিত একটি হাদিসে কুদসি বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদিসে আল্লাহ তাআলা বলেন—

«يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا، فَلْيَحْمَدِ اللهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَه»

হে আমার বান্দারা! আমি তোমাদের আমলই তোমাদের জন্য সংরক্ষিত রাখি, এরপর পুরোপুরিভাবে তার বিনিময় দান করে থাকি। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো কল্যাণ লাভ করে, সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যে তা ব্যতীত অন্য কিছু (অর্থাৎ অকল্যাণ) পায়, সে যেন নিজেকেই দোষারোপ করে।[৩১]

সাধারণভাবে নামাজ না পড়া একটি মারাত্মক অন্যায় ও কঠিন গুনাহ। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাজের হিসাব গ্রহণ করা হবে। নামাজের হিসাব সন্তোষজনক হলে সব আমলের হিসাবই সন্তোষজনক হবে আর নামাজের হিসাবে সমস্যা হলে অন্য সব আমলের হিসাবেই সমস্যা হবে।

হজরত আবু হোরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

«إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةُ»

কিয়ামতের দিন লোকদের আমলসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম তাদের নামাজ সম্পর্কে হিসাব গ্রহণ করা হবে।

এরপর নবীজি বলেন,

«يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلَائِكَتِه -وَهُوَ أَعْلَمُ- : انْظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا؟ فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَه تَامَّةً، وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا

৩১. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-২৫৭৭।

شَيْئًا قَالَ : أُنْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَه تَطَوُّعٌ قَالَ : أَتِمُّوْا لِعَبْدِيْ فَرِيضَتَه مِنْ تَطَوُّعِه، ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ»

আমাদের মহান রব বান্দার আমল সম্পর্কে পূর্ণ ইলম থাকা সত্ত্বেও ফিরেশতাদের বলবেন, দেখো তো—সে পূর্ণরূপে নামাজ আদায় করেছে, না-কি তাতে ত্রুটি করেছে? অতঃপর বান্দার নামাজ পরিপূর্ণ হলে তা তদ্রূপই লেখা হবে। অপরদিকে যদি তাতে ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়, তবে তিনি (আল্লাহ তাআলা) ফিরেশতাদের বলবেন, দেখো তো—আমার বান্দার কোনো নফল আমল আছে কি-না? যদি থাকে তবে তিনি বলবেন, তোমরা তার নফল নামাজ দ্বারা তার ফরজ নামাজের ত্রুটি মোচন করো। অতঃপর এইরূপে সমস্ত ফরজ আমলের ত্রুটি নফল আমল দ্বারা দূর করা হবে।[৩২]

তাহলে যে মুমিন বান্দার আমলনামা যথাসময়ে ফজরের নামাজ আদায়ের আমল-শূন্য, সে কিয়ামতের দিন কীভাবে কল্যাণের প্রত্যাশা করতে পারে?!

ফজরের নামাজ পরিত্যাগ করার কারণে একজন মুসলমানকে সেসব শাস্তি তো প্রদান করা হবেই, যেসব শাস্তির কথা আল্লাহ তাআলা ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথাসময়ে নামাজ আদায় না করা ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে উল্লেখ করেছেন; উপরন্তু ফজরের নামাজের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিশেষ কিছু শাস্তিও তাকে প্রদান করা হবে। ফরজ নামাজ আদায় না করে যে ব্যক্তি ঘুমিয়ে থাকে, নবীজি তার বিষয়ে এক কঠিন ও ভয়াবহ শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। আর এটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, ফজরের নামাজ আদায়ে মুসলমানদের বিরত রাখার মূল কার্যকারণ হচ্ছে নিদ্রা। সাধারণত একজন ব্যক্তি নামাজের সময় ঘুমিয়ে থাকে বলেই নামাজ পুরোপুরি ছুটে যায়।

বিশিষ্ট সাহাবি হজরত সামুরা বিন জুনদুব রাযি. প্রিয় নবীজির একটি স্বপ্নের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করেছেন। আর নবীদের স্বপ্ন তো সত্য। উক্ত স্বপ্নে নবীজি গুনাহগার মুসলমানদের শাস্তির বিভিন্ন দিক ও ধরন চিত্রায়িত করেছেন।

---

৩২. সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং-৮৬৪।

গোনাহের শাস্তি কখনো হয় কবরে, কখনো হয় জাহান্নামে, আবার কখনো উভয় স্থানে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, গত রাতে আমার কাছে দুজন আগন্তুক (জিবরাইল আ. ও মিকাইল আ.) উপস্থিত হলো। তারা আমাকে ওঠাল। এরপর বলল, চলুন। আমি তাদের সঙ্গে চলতে লাগলাম। প্রথমে আমরা কাত হয়ে শায়িত এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছলাম। দেখলাম, অপর এক ব্যক্তি পাথর নিয়ে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার মাথায় পাথর নিক্ষেপ করছে। ফলে তার মাথা ফেটে যাচ্ছে। আর পাথর গড়িয়ে নিচে পতিত হচ্ছে। এরপর সে পাথরটির অনুসরণ করে পুনরায় তা নিয়ে আসছে। ফিরে আসতে না আসতেই (প্রথম) লোকটির মাথা পুনরায় ভালো হয়ে যায়। ফিরে এসে আবার সে অনুরূপ আচরণ করে, যা পূর্বে প্রথমবার করেছিল। নবীজি বলেন, আমি আমার সাথিদ্বয়কে বললাম, 'সুবহানাল্লাহ! এরা কারা?' তারা আমাকে বলল, 'চলুন, চলুন!'

নবীজি এভাবে অন্যান্য অনেকগুলো দৃশ্যের কথা বর্ণনা করেন, যা এখানে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। এরপর নবীজির সঙ্গীদ্বয় নবীজি যা দেখলেন, তার ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য বর্ণনা শুরু করেন। নবীজি যে ব্যক্তির মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে দেখেছিলেন, তার অবস্থা বর্ণনা করে সঙ্গীদ্বয় বলেন,

'ওই যে প্রথম ব্যক্তি, যার কাছে আপনি পৌঁছেছিলেন, যার মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছিল, সে হলো ওই ব্যক্তি, যে কুরআন গ্রহণ করে তা ছেড়ে দিয়েছে আর ফরজ নামাজ আদায় না করে ঘুমিয়ে থেকেছে।'[৩৩]

প্রিয় পাঠক, আপনার কৌতূহলী মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, এত জায়গা থাকতে ফজর পরিত্যাগকারীর মাথায় কেন আঘাত করা হবে?!

আশা করি আপনার জানা আছে, ঘুমই হলো ফজরের নামাজের মূল বাধা। লোকটির মাথা চূর্ণ করা হচ্ছিল, কারণ মাথা হলো বুদ্ধি-বিবেকের স্থল মানবশরীরের সবচেয়ে মূল্যবান অঙ্গ এবং 'নিদ্রা'র কারণ।

---

৩৩. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং-৭০৪৭।

ঈমানদার ভাই আমার, ঈমানদার বোন আমার,
এ তো রসিকতা ও ঠাট্টার বিষয় নয়!
এ যে নির্মম বাস্তবতা!
এ যে কঠিন সত্য!

মনে রাখবেন, যে বা যারা অমান্য করে অভ্যস্ত, শীঘ্রই তারা ফিতনায় পতিত হবে। আর যারা ফিতনায় পতিত হবে, তারা শিকার হবে মর্মন্তুদ শাস্তির।

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾

সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের ভয় করা উচিত—না জানি তাদের ওপর কোনো বিপদ আপতিত হয় অথবা যন্ত্রণাদায়ক কোনো শাস্তি তাদেরকে আক্রান্ত করে। [সুরা নুর : ৬৩]

তৃতীয় অনন্য বৈশিষ্ট্য

সমগ্র দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুর চেয়েও মূল্যবান দু রাকাত সুন্নাত নামাজ।

ফজরের ফরজ নামাজের পূর্বে দুই রাকাত নামাজ পড়া সুন্নাত। সকল নফল (ফরজ-অতিরিক্ত) নামাজের মধ্যে এই দু রাকাত নামাজের মর্যাদা সর্বাধিক। রাসুলে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দু রাকাত সুন্নাতের যে ফজিলত বর্ণনা করেছেন, যেকোনো ঈমানদার বান্দাকে তা আকর্ষণ করবে।

উদাহরণস্বরূপ আম্মাজান হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا»

ফজরের দু রাকাত (সুন্নাত) দুনিয়া এবং দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে উত্তম।[৩৪]

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে—

«رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيْعًا»

ফজরের দু রাকাত (সুন্নাত) সমগ্র দুনিয়ার চেয়ে উত্তম।[৩৫]

প্রিয় পাঠক, আসুন, বিস্ময়কর ফজিলতপূর্ণ এই হাদিসটির মাঝে কিছুক্ষণ বিচরণ করি!

মাত্র দু রাকাত নামাজ! মাত্র ছয়-সাত মিনিট! কী অসীম ফজিলত! আল্লাহু আকবার!

আচ্ছা, আমরা ফজরের নামাজ পড়ি না কেন?!

পার্থিব কোনো স্বার্থ বা প্রয়োজনের কারণে রাতে ঘুমাতে দেরি হয়ে গেছে!

ফজরের ওয়াক্তের পরও আরও কিছুক্ষণ ঘুমাতে মন চাইছে!

---

৩৪. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-৭২৫।

৩৫. ইমাম আহমাদ, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং-২৬২৮৬।

সকাল সাতটা-আটটা পর্যন্ত ঘুমাতে পারলে সারাদিনের কাজের জন্য অনেক বেশি 'ফ্রেশ' থাকা যাবে!

বিষয়টা কি এমনই নয়?!

অথচ এ সবকিছুই তো পার্থিব জীবনের অতি তুচ্ছ ও সামান্য অংশ!

একটু ভেবে দেখুন, এই যৎসামান্যের বিপরীতে আপনি কী হারাচ্ছেন?!

আবারও একবার পেছনের হাদিসটি পাঠ করুন।

'ফজরের দু রাকাত (সুন্নাত) দুনিয়া এবং দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে উত্তম!'

সমগ্র পৃথিবী এবং পৃথিবীতে বিদ্যমান সমস্ত সম্পদ, ধনভান্ডার, পদ-পদমর্যাদা, কাজ-কর্ম, প্রলুব্ধকর ও মনোহর বিষয়াদি—সবকিছু মিলেও ফজরের দু রাকাত সুন্নাতের সমমানবিশিষ্ট নয়!

ভুলে যাবেন না, এ ফজিলত ফজরের দু রাকাত সুন্নাতের। তাহলে ফজরের দু রাকাত ফরজ নামাজ!

আল্লাহু আকবার! ফরজ নামাজ তো ফরজ নামাজ-ই! হাজারো সুন্নাত ইবাদত মিলেও তো এক ফরজ ইবাদতের সমপাল্লার হবে না।

দু রাকাত সুন্নাত নামাজের এই অত্যুচ্চ মর্যাদা কিন্তু দীর্ঘ কিয়াম বা দীর্ঘ কেরাতের কারণে নয়!

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত ফজরের নামাজের দু রাকাত সুন্নাত অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কেরাতে আদায় করতেন।

হজরত আবু হোরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সুন্নাতের প্রথম রাকাতে সুরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সুরা ইখলাস পড়তেন।[৩৬]

অপরদিকে আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা রাযি. বর্ণনা করেন, আমি নবীজিকে ফজরের দু রাকাত (সুন্নাত) আদায় করতে দেখতাম। তিনি তা এত সংক্ষেপে পড়তেন যে, আমি মনে মনে বলতাম, নবীজি উম্মুল কিতাব (সুরা ফাতিহা) পড়েছেন তো![৩৭]

---

৩৬. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং-৭২৬।

৩৭. *সুনানে নাসায়ি*, হাদিস নং-৯৪৬।

বোঝা গেল, ফজরের সুন্নাতের এই অত্যুচ্চ মর্যাদা দীর্ঘ কেরাতের কারণে নয়। কেরাতের দীর্ঘতা বা নামাজের দীর্ঘতার কারণে এ দু রাকাত নামাজের মর্যাদা সমগ্র পৃথিবীর চেয়ে অধিক হয়নি। মর্যাদার কারণ হলো এই দু রাকাত নামাজ আদায়ের সময়কাল!

যে ব্যক্তি পুরো দুনিয়ার সকল চাহিদা ও লালসাকে পেছনে ঠেলে দিয়ে ফজরের নামাজের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বেই জেগে ওঠে এবং ফজরের দু রাকাত সুন্নাত আদায় করে, সে এক ঈমানি পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়। সে যখন ফজরের নামাজ আদায় করার জন্য জাগতিক যাবতীয় প্রয়োজন ও চাহিদা উপেক্ষা করে, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে এই দুই রাকাত নামাজের বিনিময়ে সমগ্র পৃথিবীর চেয়েও বিশাল ও মহান সাওয়াব দান করেন।

হজরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাজের দু রাকাত (সুন্নাত)-এর ন্যায় অধিক গুরুত্ব অন্য কোনো নফল নামাজের ক্ষেত্রে দিতেন না।[৩৮]

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. (বুখারি শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ) 'ফাতহুল বারি'তে লিখেছেন, ফজরের সুন্নাত ছাড়া (বিভিন্ন) নামাজের আগে-পরের অন্য কোনো সুন্নাত সম্পর্কে এরূপ বর্ণনা সংরক্ষিত নেই যে, নবীজি সফরে তা আদায় করেছেন।

ফজরের সুন্নাতের এই অত্যধিক গুরুত্বের কারণেই হজরত আবু হোরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত এক হাদিসে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

«لَا تَدَعُوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ؛ وَإِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ»

তোমরা এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষ তোমাদেরকে তাড়া করা অবস্থায়ও ফজরের দু রাকাত (সুন্নাত) ছেড়ো না।[৩৯]

---

৩৮. সহিহ বুখারি, হাদিস নং-১১৬৯।

৩৯. ইমাম আহমাদ, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং-৯২৫৩ ও সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং-১২৫৮।

অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবিলার সময়, প্রতিপক্ষের ছুটন্ত অশ্ব পদদলিত করার সময় এবং যুদ্ধের কঠিনতম মুহূর্তেও আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দু রাকাত সুন্নাত ছাড়তে নিষেধ করেছেন।

তাহলে প্রিয় পাঠক, ফজরের দু রাকাত ফরজ নামাজ সম্পর্কে আপনার কী ধারণা! ফরজ দু রাকাত কখন ছাড়া যেতে পারে?!

এই অত্যুচ্চ ফজিলতের কারণেই কখনো অনিবার্য কোনো কারণে ফজরের সুন্নাত ছুটে গেলে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কাজা করে নিতেন। তাহাজ্জুদ বাদে আর কোনো সুন্নাত বা নফল নামাজের ক্ষেত্রে কাজা আদায়ের এরূপ পাবন্দি নবীজি করেননি।

প্রিয় পাঠক, স্বাভাবিকভাবেই ফজরের দু রাকাত সুন্নাতের এই অতি গুরুত্ব ও অত্যুচ্চ ফজিলতের অনিবার্য দাবি হলো ফরজ দু রাকাতের মর্যাদা-মূল্য ও গুরুত্ব আরও বেশি। বিষয়টি এভাবে হয়তো কখনো ভাবা হয়নি! সত্যিই ভাবনার জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি বিষয়!

হে মুসলিম, হে কল্যাণপ্রত্যাশী, এক মুঠো মাটির জন্য এত হয়রান তুমি! দু মুঠো ভাতের খোঁজে এত ক্লান্ত তুমি!

ওঠো, বিছানা ছাড়ো! দু হাতে তুলে নাও পুরো পৃথিবী! পুরো পৃথিবীর চেয়েও শ্রেষ্ঠতম সম্পদ!

চতুর্থ অনন্য বৈশিষ্ট্য

অনুপম স্বাতন্ত্র্য! বিশেষ দোয়া!

সকল ফরজ নামাজই গুরুত্বপূর্ণ। সব ফরজ নামাজই ফজিলতপূর্ণ। কিন্তু পারস্পরিক তুলনার বিচারে অন্যান্য ফরজ নামাজের তুলনায় ফজরের নামাজের আছে বিশেষ মর্যাদা ও স্বকীয়তা, শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতন্ত্র্য।

এ কারণেই নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাজের এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, যা অন্য কোনো নামাজের ক্ষেত্রে করেননি। নবীজির হাদিসসমূহের আলোকে অন্যান্য ফরজ নামাজের তুলনায় ফজরের নামাজের সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করা যায়।

উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি দিক উল্লেখ করছি।

[এক]

মুসলমানদের ওপর ফরজকৃত সর্বপ্রথম নামাজ হচ্ছে ফজর ও আছরের নামাজ। ইসলামের সূচনালগ্নে ফজরের নামাজ ছিল দু রাকাত; এখনও দু রাকাতই আছে। অপরদিকে আছরের নামাজ শুরুতে দু রাকাত থাকলেও পরবর্তীতে ইসরা ও মেরাজের ঘটনার পর আছরের রাকাত-সংখ্যা বৃদ্ধি করে চারে উন্নীত করা হয়।

অর্থাৎ ফজরের নামাজই একমাত্র নামাজ, যা ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে অদ্যাবধি সকল যুগের সকল মুসলমান একই পদ্ধতিতে একই সময় আদায় করে আসছে। নিঃসন্দেহে এটি ফজরের নামাজের উল্লেখযোগ্য একটি বৈশিষ্ট্য। যেন পৃথিবীর কোনো যুগের কোনো মুসলমান এই নামাজ হতে অমুখাপেক্ষী নয়! ফজরের নামাজ প্রিয় নবীজির ওপর অবতীর্ণ অতি প্রাথমিক বিধানগুলোর একটি।

[দুই]

ফজরের আজান অন্যান্য নামাজের আজানের চেয়ে ব্যতিক্রম। হজরত আবু মাহযুরা রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ফজরের নামাজের আজানে 'হাইয়া আলাল ফালাহ'-এর পর দুবার 'আসসালাতু খাইরুম মিনান নাওম' বলতে শিক্ষা দিয়েছেন।[৪০]

প্রিয় পাঠক, আপনি ভাবতে পারেন, এটি কোনো বৈশিষ্ট্য হলো! একটি অতিরিক্ত বাক্যই তো!

আমার অনুরোধ, কিছুক্ষণ এই গভীর মর্মসমৃদ্ধ বাক্যটির অর্থ নিয়ে ভাবুন।

«اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ»

নামাজ নিদ্রা হতে উত্তম!

সাধারণত কী কারণে আপনি ফজরের নামাজ আদায় করতে পারেন না?

নিদ্রা ও বিছানার স্বাদ-ই কি ফজরের নামাজের পথে মূল অন্তরায় নয়?!

তাহলে শুনুন, সত্যবাদী নবী আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, নিদ্রা আপনার বিবেচনায় যতই গুরুত্বপূর্ণ, উপকারী ও আরামদায়ক হোক না কেন; ফজরের নামাজ নিদ্রার চেয়েও শ্রেয়তর ও উত্তম!

আপনি যদি নবীজিকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করে থাকেন, যদি বিশ্বাস করে থাকেন, তিনি যা বলেন, তা পূর্ণ সত্য; কোনো মিথ্যার মিশ্রণ তাতে নেই, তাহলে এখানে না মানার কোনো যুক্তি নেই।

আর যদি আপনি মনে করেন যে, ব্যক্তিগত পরিস্থিতির কারণে আপনার জন্য ফজরের সময় সজাগ হওয়ার চেয়ে নিদ্রাই বেশি উপকারী, তাহলে তো অত্যন্ত ঝুঁকি ও চিন্তার বিষয়! আপনার আরও গভীর দৃষ্টিতে নিজের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

প্রিয় পাঠক, এ তো সাধারণ কোনো বিষয় নয়; এ যে ঈমানের বিষয়!

---

৪০. সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং-৫০০।

[তিন]

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরই কিছু দোয়া ও অজিফা পাঠের উপদেশ দিয়েছেন। যেমন: তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ, তেত্রিশ/চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার পাঠ করা, ইসতেগফার ও অন্যান্য আরও কিছু দোয়া।[৪১]

কিন্তু নবীজি এগুলো ছাড়াও আরও কিছু বিশেষ জিকির ও দোয়া উল্লেখ করেছেন এবং ফজরের পর সেগুলো পাঠ করতে বলেছেন।

উদাহরণস্বরূপ হজরত আবু যর রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

«مَنْ قَالَ فِيْ دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَهُوَ ثَانٍ رِجْلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيْكَ لَه، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَتْ لَه عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمُحِيَ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَه عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَ يَوْمَه ذٰلِكَ كُلَّه فِيْ حِرْزٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُوْهٍ، وَحُرِسَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَمْ يَنْبَغِ لِذَنْبٍ أَنْ يُدْرِكَه فِيْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا الشِّرْكَ بِاللهِ»

ফজরের নামাজ শেষে কোনোরূপ কথা বলার আগে পা ফেরানোর পূর্বে যদি কেউ দশবার নিম্নের দোয়াটি পাঠ করে, তবে তার জন্য দশটি নেকি লেখা হবে, দশটি গুনাহ মাফ করা হবে, দশটি দরজা বুলন্দ করা হবে; সারা দিন সে সব ধরনের অপছন্দনীয় বিষয় থেকে নিরাপদ থাকবে, শয়তানের আক্রমণ হতে রক্ষা পেতে তাকে প্রহরা

[৪১]. ফরজ নামাজের পর নবী কারিম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব দোয়া পাঠ করেছেন বা সাহাবায়ে কেরামকে পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, তার একটি সংকলন এই বইয়ের শেষে পরিশিষ্ট-১ শিরোনামে যুক্ত করা হয়েছে। আর বিশেষভাবে ফজরের নামাজের পর পাঠ-উপযুক্ত দোয়াসমূহ সংকলন করা হয়েছে পরিশিষ্ট-২ শিরোনামে। [অনুবাদক]

প্রদান করা হবে আর শিরক ব্যতীত অন্য কোনো গুনাহ সেদিন তাকে কাবু করতে পারবে না।[৪২]

দোয়াটি হলো—

«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيْكَ لَه، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ»

হজরত মুসলিম বিন হারিস রাযি. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন[৪৩]—

«وَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ كَذٰلِكَ، فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ فِيْ يَوْمِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا»

ফজরের নামাজ আদায়ের পর যদি তুমি দোয়াটি অনুরূপ (সাত বার) পাঠ করো, আর তুমি সেদিন মারা যাও, তাহলে তুমি জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি পাবে।[৪৪]

দোয়াটি হলো— «اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ»

এগুলো একেকটি অমূল্য ফজিলত; কোনো মূল্য দিয়ে এর মূল্যমান নিরূপণ সম্ভব নয়! আর এসব ফজিলত কেবল এই নির্দিষ্ট সময়ে দোয়া পাঠ করলেই লাভ করা যাবে।

---

৪২. জামে তিরমিজি, হাদিস নং-৩৪৭৪।

৪৩. পূর্ণ হাদিসটি হলো—

«إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْ: اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذٰلِكَ ثُمَّ مِتَّ فِيْ لَيْلَتِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا»

যখন তুমি মাগরিবের নামাজ শেষ করবে, তখন সাতবার এই দোয়া পড়বে— «اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ» 'হে আল্লাহ, আমাকে জাহান্নাম থেকে পানাহ দিন।' কেননা, সন্ধ্যায় যদি তুমি এ দোয়া পাঠ করো আর সে রাতে মারা যাও, তাহলে তুমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। আর ফজরের নামাজ আদায়ের পর যদি তুমি এরূপ বলো, আর তুমি যদি সেদিন মারা যাও, তবে তুমি জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

৪৪. সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং-৫০৭৯।

[চার]

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত মুসলমানদেরকে ফরজ নামাজ সংক্ষেপে পড়ার নির্দেশ দিতেন। কিন্তু স্বয়ং নবীজি-ই সাধারণত ফজরের নামাজে দীর্ঘ কেরাত পড়তেন।

হজরত আবু বারযা আসলামি রাযি. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাজে একশ থেকে ষাট আয়াত তেলাওয়াত করতেন। তিনি (ফজরের নামাজ শেষ করে) এমন সময় ফিরতেন, যখন (অধিক ফর্সা হয়ে যাওয়ায়) আমাদের একে অপরকে চিনতে পারত।[8৫]

অর্থাৎ সূর্যোদয়ের সময় ঘনিয়ে আসায় একে অপরের চেহারা পার্থক্য করতে পারত।

বিশেষ করে শুধু ফজরের নামাজের ক্ষেত্রে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীর্ঘ কেরাত পাঠের কারণ হলো—ফজরের নামাজ এমন সময় আদায় করা হয়, যখন সাধারণত মানুষের মন-মস্তিষ্ক পার্থিব চিন্তা-ভাবনা ও দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত থাকে। একজন মুসলমান তার দিন শুরু করে ফজরের নামাজের মাধ্যমে। কত চমৎকার হয় যদি আমাদের প্রতিটি দিন শুরু হয় পবিত্র কুরআনের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্রজ্ঞাপূর্ণ আয়াত পাঠ ও শ্রবণের মাধ্যমে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে ফজরের নামাজকে নিম্নোক্ত শব্দে ব্যক্ত করেছেন—

﴿وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ۭ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا﴾

এবং ফজরের সময় কুরআন পাঠে যত্নবান থাক। স্মরণ রেখো, ফজরের তিলাওয়াতে ঘটে থাকে সমাবেশ। [সুরা বনি ইসরাইল : ৭৮]

কারণ এটাই যে, অন্যান্য নামাজের তুলনায় ফজরের নামাজের কেরাত দীর্ঘ হয়ে থাকে।

---

৪৫. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-৬৪৭।

[পাঁচ]

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুক্রবার ফজরের নামাজে বিশেষ কেরাত পড়তেন। হজরত আবু হোরায়রা রাযি. কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসের ভাষ্য অনুসারে নবীজির সুন্নাত ছিল—তিনি শুক্রবার ফজরের নামাজের প্রথম রাকাতে সুরা সাজদা এবং দ্বিতীয় রাকাতে সুরা দাহর পড়তেন।[৪৬] জুমার নামাজ ব্যতীত অন্য কোনো ফরজ নামাজের এরূপ কেরাত-স্বাতন্ত্র্য নেই। আর জুমার নামাজও তো বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নামাজ। ইনশাআল্লাহ, ভিন্ন কোনো উপলক্ষ্যে অন্য কোনো গ্রন্থে জুমার নামাজের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও আলোচনা হবে।

[ছয়]

ফজরের নামাজের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো একমাত্র ফজরের নামাজই কসর[৪৭] ও একত্রিকরণ উভয়টি হতে মুক্ত।

ফজরের নামাজে কখনো কসর ও রাকাত হ্রাস হয় না, কখনো অন্য নামাজের সঙ্গে কালগত একত্রিকরণও ঘটে না।

জোহর ও আছরের নামাজে কসর ও একত্রিকরণ উভয়টিই ঘটে।

মাগরিব নামাজে কসর না হলেও এশার সঙ্গে একত্রিকরণ ঘটে।

এশার নামাজেও কসর ও একত্রিকরণ উভয়টিই ঘটে।[৪৮]

কিন্তু ফজরের নামাজ সবার চেয়ে ব্যতিক্রম। না কসর আছে, না একত্রিকরণ; না সফরে, না নিজ এলাকায় অবস্থানকালে; না হজে, না জিহাদে; না ভীতিকর পরিস্থিতিতে, না সাধারণ অবস্থায়!

নিঃসন্দেহে এটি ফজরের নামাজের চিত্তাকর্ষক একটি বৈশিষ্ট্য!

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের সকলকে ফজরের নামাজের প্রতি আগ্রহী ও যত্নবান বানিয়ে দেন।

---

৪৬. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং-৮৮০।

৪৭. সফরে থাকা অবস্থায় চার রাকাতবিশিষ্ট ফরজ নামাজ দু রাকাত পড়তে হয়। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় একে 'কসর' বলে। [অনুবাদক]

৪৮. হজের মৌসুমে আরাফার ময়দানে জোহর ও আছরের নামাজ একত্রে এবং মুজদালিফার ময়দানে মাগরিব ও এশার নামাজ একত্রে আদায় করতে হয়। [অনুবাদক]

পঞ্চম অনন্য বৈশিষ্ট্য
স্মরণীয় ও সবিশেষ সময়!

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে ফজরের নামাজের সময়কে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ফজর ও আছর ব্যতীত অন্য কোনো নামাজের সময়ের কসম করেননি। নিঃসন্দেহে এর মাধ্যমে ফজরের নামাজের সময়গত মর্যাদা প্রতিভাত হয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾

শপথ ফজর-কালের! এবং দশ রাতের! [সুরা ফজর : ১-২]

ফজরের নামাজের ওয়াক্ত এ কারণেও মর্যাদাসম্পন্ন যে, আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিকুলের বড় ও মহান একটি অংশ নিষ্পাপ ফিরেশতাগণ ফজরের সময়ের প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে থাকে।

হজরত আবু হোরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, আমি নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—

«تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمِيعِ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا، وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ»

জামাতের নামাজ তোমাদের কারও একাকী নামাজ থেকে পঁচিশ গুণ বেশি মর্যাদা রাখে। আর ফজরের নামাজে রাতের ও দিনের ফিরেশতাগণ মিলিত হয়।[৪৯]

হাদিসটি বর্ণনা করার পর আবু হোরায়রা রাযি. বলেন, তোমরা চাইলে (এর প্রমাণস্বরূপ) এ আয়াত পাঠ করো—

﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾

স্মরণ রেখো, ফজরের তিলাওয়াতে ঘটে থাকে সমাবেশ। [সুরা বনি ইসরাইল : ৭৮]

---

[৪৯]. সহিহ বুখারি, হাদিস নং-৬৪৮।

আল্লাহ তাআলা ফজরের নামাজের সময়কেই রাত-দিনের ফিরেশতাদের সাক্ষাতের নির্ধারিত সময় বানিয়ে দিয়েছেন। একটু ভাবুন; আল্লাহ তাআলা কীভাবে ফজরের নামাজের মর্যাদা সমুন্নত করে দিলেন!

বিষয়টি এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। হজরত আবু হোরায়রা রাযি. কর্তৃক বর্ণিত আরেকটি হাদিসে আছে, রাতের ফিরেশতারা ফজরের নামাজ সরাসরি প্রত্যক্ষ করার পর তখনই আসমানে চলে যায়।

নবীজি ইরশাদ করেন—

«ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ -وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ- : كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِيْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ»

তারপর তোমাদের মাঝে রাত-যাপনকারী দলটি উঠে যায়। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দাদের কোন অবস্থায় রেখে এলে? অবশ্য তিনি নিজেই তাদের ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত। উত্তরে তারা বলে, আমরা তাদের নামাজে রেখে এসেছি আর আমরা যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম, তখনও তারা নামাজে নিমগ্ন ছিল।[৫০]

প্রিয় পাঠক, একটু ভাবুন। ফিরেশতাগণ আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত হয়ে বলবে, আমরা অমুককে জামাতে ফজরের নামাজ পড়তে দেখেছি আর অমুককে ঘুমন্ত ও উদাসীন অবস্থায় পেয়েছি; সে ফজরের নামাজকে তার অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মসূচিতে রাখেনি এবং ফজরের নামাজ জামাতে আদায় তার দৈনন্দিন কর্মতালিকায় নেই।

কত পার্থক্য দু দলের মাঝে!

এক দলের জন্য রাব্বুল আলামিনের সামনে নিষ্পাপ ফিরেশতাগণের প্রশস্তি!

অপর দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও নিন্দা!

সুতরাং এখনই ভাবুন, আপনি কোন দলের অন্তর্ভুক্ত হতে চান? নিজের জন্য পছন্দের দলটি আপনিই নির্বাচন করে নিন।

৫০. সহিহ বুখারি, হাদিস নং-৫৫৫।

ষষ্ঠ অনন্য বৈশিষ্ট্য

স্বয়ং আল্লাহ তাআলার নিরাপত্তা-তত্ত্বাবধান!

প্রিয় পাঠক, স্বয়ং রাসুলে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আপনি যদি ফজরের নামাজ আদায় করেন, তাহলে সেদিন সারাদিন স্বয়ং আল্লাহর হেফাজতে থাকবেন!

আল্লাহু আকবার! কত বড় অনুগ্রহ! কত মহান দান!

হজরত জুনদুব বিন সুফিয়ান রাযি. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

«مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِيْ ذِمَّةِ اللهِ»

যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ আদায় করে, সে আল্লাহর নিরাপত্তায় থাকে।[৫১]

অর্থাৎ ফজরের নামাজ আদায়কারীর নিরাপত্তা, তত্ত্বাবধান ও জামানত সবই স্বয়ং আল্লাহর জিম্মায়!

আরেক বর্ণনায় আছে, নবীজি বলেছেন—

«فَلَا تُخْفِرُوا اللهَ فِيْ عَهْدِهِ، فَمَنْ قَتَلَه طَلَبَهُ اللهُ حَتّٰى يَكُبَّه فِي النَّارِ عَلٰى وَجْهِه»

সুতরাং আল্লাহ জিম্মাদারি ও দায়িত্বকে নষ্ট করো না। অনন্তর যে ব্যক্তি তাকে (ফজরের নামাজ আদায়কারীকে) হত্যা করবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন তলব করবেন; এমনকি তাকে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।[৫২]

অর্থাৎ হাদিসে অন্যান্য মানুষকে নির্দেশ প্রদান করা হচ্ছে যে, তোমরা ফজরের নামাজ আদায়কারীকে কষ্ট দিয়ো না!

---

৫১. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-৬৫৭।

৫২. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং-৩৯৪৫।

ফজরের নামাজ আদায়কারীর জন্য এটি জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহপ্রদত্ত এক সুমহান নিরাপত্তা-ঘোষণা!

আপনি যদি ফজরের নামাজ আদায় করে থাকেন, তাহলে আপনি আল্লাহ তাআলার নিরাপত্তায় আছেন। যে আপনাকে কষ্ট দেবে, আল্লাহ পাক তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন!

আপনি যদি ফজরের নামাজ আদায় করে থাকেন, তাহলে সারাদিন এক অপার্থিব আস্থা ও নির্ভরতা অনুভব করবেন।

দুর্যোগ ও দুর্বিপাকের সামনে, বিপদ ও মুসিবতের মোকাবিলায়, অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারীর সামনে এবং শক্তিধর ও প্রতাপশালীর সামনে আপনি অভাবনীয় দৃঢ়তা অনুভব করবেন।

কারণ, আপনি তো আছেন রাজাধিরাজ ও সৃষ্টিজগতের স্রষ্টার নিরাপত্তায়!

আপনার কিসের চিন্তা? আপনার কিসের ভয়?!

এর চেয়ে বেশি আর কী চান?!

আর এ সবকিছু মাত্র দু রাকাত নামাজের বিনিময়ে!

হ্যাঁ, মাত্র দু রাকাত নামাজ; কিন্তু এ দু রাকাত নামাজে আছে আন্তরিক নিষ্ঠা ও ঈমানি দৃঢ়তার অনন্য শক্তি! আর এ কারণেই মহান আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতিরক্ষা করবেন।

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের প্রতিরক্ষা করেন, যারা ঈমান এনেছে। জেনে রেখো, আল্লাহ কোনো বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না।

[সুরা হাজ্জ : ৩৮]

সপ্তম অনন্য বৈশিষ্ট্য

ঈমান ও ইলম চর্চার এক সেমিনার!

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বিভিন্ন কল্যাণকর বিষয় শিক্ষাদানের জন্য ফজরের নামাজ (পরবর্তী সময়)-কে এক শিক্ষা-মজলিসে পরিণত করতে সচেষ্ট হতেন। ফজর-পরবর্তী সময়ে কখনো তিনি বিভিন্ন ইলমি আলোচনা করতেন, কখনো গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় ব্যাখ্যার মাধ্যমে সুস্পষ্ট করতেন, কখনো সাহাবায়ে কেরামের প্রশ্নের উত্তর দিতেন, কখনো-বা স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করতেন অথবা এ জাতীয় অন্য কোনো নির্দেশনামূলক কাজ করতেন।

নবীজির অনন্যসাধারণ এই উদ্যোগে ফজরের নামাজ পরিণত হতো অত্যন্ত উন্নত এক ঈমানি-ইলমি সেমিনারে!

নিঃসন্দেহে এটি তারবিয়াত ও শিক্ষাদানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম। কারণ, ফজরের স্নিগ্ধ-শীতল সময়ে অন্তরজগৎ থাকে পরিচ্ছন্ন, মেধা ও বিবেক থাকে উন্মুক্ত, ফিরেশতাগণ পরিবেষ্টন করে থাকে, কথা হয় আল্লাহর ঘরে, আলোচনা করা হয় আল্লাহর বাণী, মজলিসে উপস্থিত থাকে নিষ্ঠাবান মুমিন বান্দাগণ।

আকিদা-আমল-ফিকহ ও চারিত্রিক জ্ঞান—এককথায় মহত্ত্ব ও কল্যাণের যাবতীয় দিক শিক্ষাদানের এক অপূর্ব সুযোগ!

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সময়ের সাক্ষাতে তার প্রিয় সাহাবায়ে কেরামকে বিভিন্নধর্মী ও বিচিত্র জ্ঞান সরবরাহ করতেন। এর ফলে সাহাবায়ে কেরাম বিরক্তি বা অবসন্নতার শিকার হতেন না।

নবীজি কখনো সাহাবায়ে কেরামকে তাদের অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন এবং শেষে তাদের অবস্থা-উপযোগী কোনো বিষয় বর্ণনা করতেন। যেমন হজরত আবু হোরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

একদিন ফজরের নামাজের পর সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আজ রোজাদার অবস্থায় সকাল করেছে? আবু বকর রাযি. উত্তর দিলেন, 'আমি'। নবীজি জিজ্ঞেস করলেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে জানাজায় গমন করেছে? আবু বকর রাযি. উত্তর দিলেন, 'আমি'। নবীজি এরপর জিজ্ঞেস করলেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে কোনো মিসকিনকে আহার দান করেছে? আবু বকর রাযি. উত্তর দিলেন, 'আমি'। নবীজি এবার প্রশ্ন করলেন, আজ কে কোনো অসুস্থ ব্যক্তির শুশ্রূষা করেছে? এবারও আবু বকর রাযি. উত্তর দিলেন, 'আমি'। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যে ব্যক্তির মধ্যে এসব গুণের সম্মিলন ঘটবে, সে জান্নাতে যাবে।'[৫৩]

হাদিসটি তো জানলেন। এ বিষয়টিও ভেবে দেখুন—ফজরের পূর্বেই এত সব সৎকর্ম সম্পাদন করার জন্য হজরত আবু বকর রাযি. জাগ্রত হতেন কখন?!

আরেক দিনের ঘটনা। হজরত আবু হোরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ফজরের নামাজের সময় বিলাল রাযি.-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'বিলাল! ইসলামগ্রহণের পর সর্বাধিক আশাব্যঞ্জক যে আমল তুমি করেছ, তা আমাকে বলো। আমি তো জান্নাতে (চলার সময়) আমার সামনে তোমার পাদুকাদ্বয়ের আওয়াজ শুনতে পেয়েছি! বিলাল রাযি. উত্তর দিলেন, আমি দিন-রাতের যখনই পবিত্রতা অর্জন করেছি, তখনই এই পরিমাণ নামাজ আদায় করেছি, যা আমার তাকদিরে ছিল। এর চাইতে অধিক আশাব্যঞ্জক কোনো বিশেষ আমল আমি করিনি।[৫৪]

কখনো নবীজি ফজরের পর সাহাবায়ে কেরামকে সূক্ষ্ম ও উদ্দীপক কোনো ঘটনা শোনাতেন, যা শ্রোতাদের আকর্ষণ করত এবং যার ঘুম আসত, তাকেও জাগিয়ে তুলত। যেমন হজরত আবু হোরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদিন) ফজরের নামাজ আদায় করার পর মুসল্লিদের দিকে ফিরে বসলেন।

---

৫৩. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং-১০২৮।

৫৪. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং-১১৪৯।

এরপর বললেন,

«بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوْقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا، فَقَالَتْ : إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهٰذَا، إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ»

একদা জনৈক ব্যক্তি একটি গরু হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে গরুটির পিঠে চড়ে বসল এবং গরুটিকে প্রহার করতে লাগল। তখন গরুটি বলল, আমাদেরকে এ উদ্দেশ্যে (আরোহণের জন্য) সৃষ্টি করা হয়নি; আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে চাষাবাদের কাজে ব্যবহারের জন্য।

গরুর কথা বলার ঘটনা শুনে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম বলে উঠল, 'সুবহানাল্লাহ! গরুও কথা বলে!'

নবীজি বললেন,

«فَإِنِّيْ أُوْمِنُ بِهٰذَا أَنَا وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ»

আমি এবং আবু বকর ও উমর এটি বিশ্বাস করি।

অথচ তারা দুজন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না!

এরপর নবীজি বললেন,

«وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِيْ غَنَمِه إِذْ عَدَا الذِّئْبُ، فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ، فَطَلَبَ حَتّٰى كَأَنَّهُ اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ : هٰذَا اسْتَنْقَذْتَهَا مِنِّيْ، فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ، يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِيْ»

জনৈক রাখাল একদিন তার ছাগলপালের মাঝে অবস্থান করছিল, হঠাৎ একটি চিতাবাঘ ছাগলপালের মধ্যে ঢুকে একটি ছাগল নিয়ে গেল। রাখাল বাঘের পিছু ধাওয়া করে ছাগলটি উদ্ধার করল। তখন বাঘটি বলল, তুমি ছাগলটি আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলে বটে; তবে ওই দিন কে ছাগলকে রক্ষা করবে, যেদিন হিংস্র জন্তু ওদের আক্রমণ করবে এবং আমি ছাড়া তাদের অন্য কোনো রাখাল থাকবে না?!

লোকেরা বলল, 'সুবহানাল্লাহ! চিতাবাঘ কথা বলে!'

নবীজি বললেন,

«فَإِنِّي أُوْمِنُ بِهٰذَا أَنَا وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ»

আমি এবং আবু বকর ও উমর এটি বিশ্বাস করি।

অথচ তারা উভয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না![৫৫]

আবার কখনো নবীজি নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে পূর্ণ বক্তব্য ও প্রভাবপূর্ণ নসিহত প্রদান করতেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে সুসংক্ষিপ্ত-সুসমৃদ্ধ কোনো শিক্ষা প্রদান করতেন। যেমন হজরত ইরবায বিন সারিয়া রাযি. বর্ণনা করেন, একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করলেন।[৫৬] এরপর আমাদের দিকে ফিরে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী এক ভাষণ প্রদান করলেন। ফলে আমাদের চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত হলো এবং অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হলো। আমাদের মধ্যে একজন বলল, 'আল্লাহর রাসুল, মনে হচ্ছে এ আপনার বিদায়ী ভাষণ; সুতরাং আমাদের আরও কিছু ওসিয়ত করুন।' তখন নবীজি বললেন,

«أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا؛ فَإِنَّه مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِيْ فَسَيَرٰى بَعْدِي اخْتِلَافًا كَثِيْرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ، تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»

আমি তোমাদের তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিচ্ছি এবং আনুগত্যেরও; যদিও তোমাদের আমির কোনো হাবশি গোলাম হয়। কেননা, তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে, তারা বহু

৫৫. সহিহ বুখারি, হাদিস নং-৩৪৭১।

৫৬. মুসনাদে আহমাদ-এর বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে ফজরের নামাজের কথা এসেছে। হাদিস নং-১৭১৪৪।

মতভেদ দেখতে পাবে। এমতাবস্থায় তোমাদের উচিত হবে আমার ও আমার সুপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাতের অনুসরণ করা; যারা সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী। তোমরা তা দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করবে ও আঁকড়ে থাকবে। আর তোমরা বিদআতের অনুসরণ-অনুকরণ থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, প্রত্যেক নতুন বিষয়ই বিদআত আর প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহি।[৫৭]

এ সকল বর্ণনা এবং এ জাতীয় অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা এ কথাই প্রতীয়মান ও প্রমাণিত হয় যে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাজের পর কোমল আচরণের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামকে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিতেন, শরিয়তের বিভিন্ন বিষয়ের মর্মজ্ঞান দান করতেন এবং তাদের চিন্তা-চেতনা, মন-মানস প্রসারিত করতেন। নিঃসন্দেহে নবীজির এই কর্মপন্থার ফলাফল ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। ঈমানি ও ইলমি এই মজলিসের আকর্ষণে দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তিও ছুটে আসত ফজরের নামাজে, সকলেই লাভ করত ফজরের নামাজের 'আজরে আজিম'!

---

৫৭. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং-৪২, ইমাম আহমাদ, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং-১৭১৪৪, সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং-৪৬০৭ ও জামে তিরমিজি, হাদিস নং-২৬৭৬।

অষ্টম অনন্য বৈশিষ্ট্য

দৈনিক আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ কোর্স!

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে ফজরের নামাজের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদেই অবস্থান করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। ফলে এ সময়টুকুও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঈমানি প্রশিক্ষণ কোর্সে পরিণত হতো এবং এর মাধ্যমেই সাহাবায়ে কেরামের দিবসের সূচনা হতো।

পেছনে আমরা জেনেছি, নবীজি অন্যান্য ফরজ নামাজের তুলনায় ফজরের নামাজের কেরাত দীর্ঘ করতেন। ফজরের নামাজে তিনি ষাট থেকে একশ আয়াত তেলাওয়াত করতেন। এরপর সংক্ষিপ্ত দরসে সাহাবায়ে কেরামের সামনে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন অথবা তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতেন। এরপর তাদেরকে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর জিকিরের উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান করতে উদ্বুদ্ধ করতেন।

হজরত আনাস বিন মালিক রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

«مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِيْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَه كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ»

যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করবে, তারপর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে থেকে আল্লাহর জিকির করবে, এরপর দু রাকাত (ইশরাকের) নামাজ পড়বে, তাকে এক হজ ও এক উমরার সাওয়াব প্রদান করা হবে।

এরপর নবীজি তিনবার বলেন, পূর্ণ, পূর্ণ, পূর্ণ (অর্থাৎ পূর্ণ হজ ও পূর্ণ উমরার সাওয়াব)।[৫৮]

---

৫৮. জামে তিরমিজি, হাদিস নং-৫৮৬। যদিও কেউ কেউ এ হাদিসটিকে (সনদের বিচারে) দুর্বল বলেছেন; কিন্তু ইমাম তিরমিজি হাদিসটিকে 'হাসান-গারিব' স্তরের গণ্য করেছেন।=

হজরত জাবের বিন সামুরা রাযি. বর্ণনা করেন, নবীজি (ফজর) নামাজ আদায়ের পর ভালোভাবে সূর্যোদয় হওয়া পর্যন্ত চারজানু হয়ে (মসজিদেই) বসে থাকতেন।[৫৯]

নবীজি এ সময় প্রভাতকালের বিভিন্ন দোয়া ও অজিফা পাঠ করতেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে ফজরের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে এসব দোয়া ও অজিফা পাঠের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। এ সংক্রান্ত সবগুলো দোয়াই অতি মূল্যবান এবং হামদও শোকর, ইসতেগফার ও তাসবিহ, আল্লাহর আশ্রয়প্রার্থনা, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থার বহিঃপ্রকাশ ইত্যাদি বিষয়ে সমৃদ্ধ। এসব দোয়া পাঠের মাধ্যমে একজন মুমিন বান্দার দিবসের সূচনা হয় অত্যন্ত মনোরম ও বরকতপূর্ণ পদ্ধতিতে।

উদাহরণস্বরূপ আবদুল্লাহ বিন গাননাম বাইয়াযি রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

«مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ : اَللّٰهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ، وَلَكَ الشُّكْرُ، فَقَدْ أَدّٰى شُكْرَ يَوْمِهِ، وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ حِيْنَ يُمْسِيْ فَقَدْ أَدّٰى شُكْرَ لَيْلَتِهِ»

যে ব্যক্তি সকালে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবে, সে যেন দিবসের শোকর আদায় করল। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এরূপ বলবে, সে যেন রাতের শোকর আদায় করল। দোয়াটি হলো—

«اَللّٰهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ، وَلَكَ الشُّكْرُ»

=অধিকন্তু ইমাম তাবারানি রহ. রেওয়ায়েতটির স্বপক্ষে উত্তম সনদবিশিষ্ট অনেকগুলো শাহিদ (সমার্থক হাদিস) উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়াও মুনযিরি রহ. আত-তারগিব গ্রন্থে বলেছেন, 'এর আরও কিছু শাহিদ আছে।'

৫৯. সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং-৪৮৫০।

প্রভাতে আমার কাছে যে নিয়ামত আছে, তা আপনিই দিয়েছেন। আপনি একক, আপনার কোনো শরিক নেই। সমস্ত প্রশংসা ও শোকর আপনার-ই।(৬০)

হজরত আবু সাইদ খুদরি রাযি. বর্ণনা করেন, একদা নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে আবু উমামা নামক জনৈক আনসারি সাহাবিকে দেখতে পেলেন। নবীজি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আবু উমামা, তোমাকে নামাজের সময় ব্যতীত মসজিদে উপবিষ্ট দেখছি যে?!' আবু উমামা উত্তর দিলেন, 'আল্লাহর রাসুল, সীমাহীন দুশ্চিন্তা ও ঋণভারে জর্জরিত হওয়ায় (এ সময় মসজিদে উপস্থিত হয়েছি)।' নবীজি বললেন, 'আমি কি তোমাকে এমন এক দোয়া-বাক্য শিক্ষা দেবো না, যা পাঠ করলে আল্লাহ তোমার দুশ্চিন্তা দূরীভূত করবেন এবং তোমার কর্জ পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন?' 'অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসুল।' আবু উমামা উত্তর দিলেন। নবীজি বললেন, তুমি সকাল-সন্ধ্যায় এরূপ বলবে,

«اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ»

হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি; আমি আপনার নিকট দুর্বলতা ও অলসতা হতে আশ্রয় কামনা করছি; আপনার নিকট কাপুরুষতা ও কৃপণতা হতে নাজাত কামনা করছি এবং আমি আপনার নিকট ঋণভার ও মানুষের দুষ্ট প্রভাব হতে পরিত্রাণ চাচ্ছি।

আবু উমামা বলেন, অতঃপর আমি এরূপ আমল করি। এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তাআলা আমার যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা বিদূরিত করেন এবং ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন।(৬১)

হজরত শাদ্দাদ বিন আওস রাযি. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সায়্যিদুল ইসতেগফার হলো—

---

[৬০]. সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং-৫০৭৩।

[৬১]. সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং-১৫৫৫।

«اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ، فَاغْفِرْ لِيْ؛ فَإِنَّه لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ»

হে আল্লাহ, আপনিই আমার পালনকর্তা। আপনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। আপনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন আর আমি আপনারই গোলাম। আমি আমার সাধ্যানুযায়ী আপনার সঙ্গে কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের ওপর সুদৃঢ়ভাবে কায়েম আছি। আমি আমার প্রতি আপনার নিয়ামত স্বীকার করছি এবং আমার কৃত গুনাহসমূহ স্বীকার করছি। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন। আপনি ছাড়া তো ক্ষমা করার আর কেউ নেই। আমি আমার কৃত গুনাহের মন্দ পরিণাম হতে আপনার কাছে পানাহ চাচ্ছি।[৬২]

(নবীজি বলেন,) যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এই ইসতেগফার পড়বে, আর ওই রাতেই মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (রাবি বলেন, অথবা তিনি বলেছেন, সে হবে জান্নাতি।) আর যে ব্যক্তি সকালে এ দোয়া পাঠ করবে, আর ওই দিনই মারা যাবে, সে-ও অনুরূপ জান্নাতি হবে।

সকালে পাঠ্য সুনির্দিষ্ট জিকির ও দোয়া সংখ্যায় যেমন অনেক, তেমনই গভীর মর্মসমৃদ্ধ।[৬৩]

প্রিয় পাঠক, আপনিও যদি প্রতিদিন মসজিদে ফজরের জামাতে উপস্থিত হন এবং এই নববি আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ নেন, ভেবে দেখুন, মহান আল্লাহ তাআলার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন হবে! মানুষের সঙ্গে আপনার প্রতিটি আচরণ-উচ্চারণ কেমন হবে!

একটি দিবসের এর চেয়েও চমৎকার সূচনা কি সম্ভব?!

---

৬২. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং-৬৩০৬।

৬৩. এ জাতীয় কিছু দোয়া ও জিকির পরিশিষ্ট-২ এ উল্লেখ করা হয়েছে। [অনুবাদক]

নবম অনন্য বৈশিষ্ট্য
অর্ধেক জীবনের গুনাহ-মোচক।

এটি ফজরের নামাজের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষ্যমতে প্রতিটি নামাজ উক্ত নামাজ ও তার পূর্ববর্তী নামাজের মধ্যকার সময়ে সংঘটিত গুনাহসমূহকে মোচন করে।

যেমন হজরত আবু হোরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

«اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ»

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, এক জুমা থেকে আরেক জুমা এবং এক রমজান থেকে অপর রমযান মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফফারা হয়ে যায়; যদি সে কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে।[৬৪]

হজরত উসমান বিন আফফান রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

«مَا مِنَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُه صَلَاةٌ مَكْتُوْبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهَا وَخُشُوْعَهَا وَرُكُوْعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيْرَةً، وَذٰلِكَ الدَّهْرَ كُلَّه»

যখন কোনো মুসলিম ব্যক্তির ফরজ নামাজের ওয়াক্ত হয় আর সে উত্তমরূপে অজু করে, উত্তমরূপে নামাজের বিনয় ও রুকু আদায় করে, তাহলে যতক্ষণ না সে কোনো কবিরা গুনাহে লিপ্ত হবে, তার

৬৪. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-২৩৩।

> এই নামাজ তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহের জন্য কাফফারা হয়ে যাবে। আর এ ফজিলত সর্বযুগেই বিদ্যমান থাকবে।[৬৫]

আল্লাহু আকবার! এ তো রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে এক মহান নিয়ামত ও করুণা-দান!

এবার মূল কথায় আসি। এশার নামাজ ও ফজরের নামাজের মধ্যকার সময়টুকু হলো দুই নামাজের মধ্যকার সবচেয়ে দীর্ঘ সময়; পূর্ণ রাত অর্থাৎ দিনের অর্ধেক সময়। সুতরাং ফজরের নামাজ অর্ধেক দিনের গুনাহ মোচন করে আর বাকি চার ওয়াক্ত নামাজ দিনের বাকি অর্ধেক সময়ের পাপ মোচন করে। এভাবেও বলা যায় যে, যিনি ফজরের নামাজ নিয়মিত আদায় করেন, তার অর্ধেক জীবনের গুনাহ মার্জনা করা হয় আর বাকি নামাজগুলোর কারণে হয় বাকি অর্ধেক জীবনের গুনাহ মোচন। এই ফজিলত তখন প্রযোজ্য, যখন বান্দা কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে।

নিঃসন্দেহে এটি অনেক বড় এক ফজিলত! কল্পনাতীত এক নিয়ামত!

দশম অনন্য বৈশিষ্ট্য

প্রতিটি পদক্ষেপে আসমানি বরকত!

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়েও সাহাবায়ে কেরামের ও আমাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, প্রত্যূষে সমূহ বরকত নিহিত আছে। সকালের প্রথম সময় (ফজরের নামাজ-পরবর্তী সময়) পুরো দিনের মধ্যে সবচেয়ে বরকতপূর্ণ সময়। আর এ বরকত সে-ই অর্জন করতে পারে, যে প্রত্যূষে জেগে উঠে ফজরের নামাজ আদায় করে এবং দিনের সূচনা-অংশ হতেই দিনকে কাজে লাগাতে শুরু করে।

হজরত সখর গামিদি রাযি. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

«اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا»

হে আল্লাহ, তুমি আমার উম্মতের জন্য তাদের ভোরের মধ্যে বরকত দান করো।[৬৬]

হাদিসে উল্লেখিত বরকত সর্বজনীন ও সর্বদিক থেকে ব্যাপক। বরকত প্রতিটি বস্তুতে, বরকত প্রতিটি কাজে; ব্যবসায়, কৃষিকাজে, পড়াশোনায়, সফরে, আল্লাহর রাস্তায় অভিযানে।

হাদিসটির রাবি সাহাবি সখর গামিদি রাযি.-এর ভাষ্য অনুসারে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও কোনো ক্ষুদ্র সেনাদল বা বৃহৎ সেনাবাহিনী প্রেরণ করলে তাদেরকে দিনের প্রথমাংশে প্রেরণ করতেন। সখর গামিদি রাযি. নিজে এই হাদিসের নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করেছেন এবং উপকৃত হয়েছেন।

---

৬৬. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং-২২৩৬, সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং-২৬০৬ ও জামে তিরমিজি, হাদিস নং-১২১২।

সখর রাযি. ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি তার ব্যবসায়ী কাফেলাকে কোথাও বাণিজ্যের জন্য প্রেরণ করলে দিনের প্রথম ভাগেই প্রেরণ করতেন। এর ফলে তিনি প্রচুর সম্পদের অধিকারী হন।

মুসনাদে আহমাদের রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে—সখর রাযি.-এর সম্পদে এত প্রবৃদ্ধি ঘটেছিল যে, তিনি সম্পদ কোথায় রাখবেন, তা-ই জানতেন না![৬৭]

হজরত নোমান বিন মুকরিন রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর হয়ে গেলে সূর্য না ওঠা পর্যন্ত যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতেন; সূর্যোদয় হওয়ার পর যুদ্ধ করতেন। বলা হতো,

«تَهِيْجُ رِيَاحُ النَّصْرِ وَيَدْعُو الْمُؤْمِنُوْنَ لِجُيُوْشِهِمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ»

এই সময় আল্লাহর সাহায্যের হাওয়া প্রবাহিত হয় এবং মুমিনরা তাদের নামাজে মুসলিম বাহিনীর জন্য দোয়া করে।[৬৮]

হজরত আনাস বিন মালিক রাযি. কর্তৃক বর্ণিত এক বর্ণনায় আছে, খায়বার যুদ্ধের দিন ভোরে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গালাসের ওয়াক্তে (ফজরের প্রথম ওয়াক্তে) ফজরের নামাজ আদায় করলেন। তিনি তখন খায়বারবাসীর নিকটেই অবস্থান করছিলেন। এরপর তাদের ওপর আক্রমণ করলেন এবং বললেন,

«اَللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ! إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ»

আল্লাহু আকবার! খায়বার ধ্বংস হোক! আমরা যখন কোনো সম্প্রদায়ের আঙিনায় অবতরণ করি, তখন ওই সতর্ককৃতদের প্রভাত হবে কতই না অশুভ![৬৯]

সুতরাং দিবসের প্রথম প্রহরেই সমূহ বরকত ও ফজিলত, নুসরত ও সাহায্য এবং বিজয়ের বার্তা নিহিত।

কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি এই বরকতপূর্ণ সময়ে ঘুম থেকে জাগ্রত না হয়, তাহলে কী হয়? কী ঘটে যদি সে দিনের সবচেয়ে বরকতপূর্ণ এই সময়ের কথা

---

৬৭. ইমাম আহমাদ, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং-১৯৪৮১।
৬৮. জামে তিরমিজি, হাদিস নং-১৬১২।
৬৯. সুনানে নাসায়ি, হাদিস নং-৫৪৭।

ভুলে গিয়ে উদাসীন অবস্থায় ঘুমিয়ে থাকে? উপেক্ষা করে আল্লাহর হাবিব আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সকল হিতোপদেশ? কী ঘটে যখন কোনো মানুষ তার দিন শুরু করে এই কল্যাণ ছুটে যাওয়ার পর? প্রিয় নবীজি তাও বর্ণনা করে গেছেন।

হজরত আবু হোরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

«يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ثَلَاثَ عُقَدٍ إِذَا نَامَ، بِكُلِّ عُقْدَةٍ يَضْرِبُ عَلَيْكَ لَيْلًا طَوِيلًا، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عَنْهُ عُقْدَتَانِ، فَإِذَا صَلَّى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ»

শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের মাথার পেছন দিকে তিনটি গিঁট দেয়, যখন সে ঘুমিয়ে পড়ে। শয়তান প্রতিটি গিঁটে এই বলে ফুঁ দেয় যে, তোমার সামনে দীর্ঘ রাত। সে যখন জেগে উঠে আল্লাহর নাম নেয়, তখন একটি গিঁট খুলে যায়; যখন অজু করে, দুটি গিঁট খুলে যায়; আর যখন নামাজ আদায় করে, তখন সবগুলো গিঁটই খুলে যায়। ফলে সে উৎফুল্ল ও আনন্দিত মনে ভোর করে। অন্যথায় সে ভোর করে বিমর্ষ মনে, অলস অবস্থায়।[৭০]

এ কথাও মনে রাখুন যে, এ হাদিসটি কারও কারও মতে তাহাজ্জুদের ফজিলত সম্পর্কে; ফজরের ফজিলত সম্পর্কে নয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ফজরের নামাজেরও পূর্বে সুবহে সাদিকেরও পূর্বে কমপক্ষে দু রাকাত নামাজের জন্য হলেও জাগ্রত হয় না, সে সকাল করে বিমর্ষ মনে অলস অবস্থায়। তাহলে যে ব্যক্তি ফজরের ফরজ নামাজ না পড়েই ঘুমিয়ে থাকে, তার সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

প্রিয় পাঠক, এরপরও কি আমাদের যাপিত জীবনে অলসতা ও উদাসীনতাই প্রভাব বিস্তার করে যাবে?! আমাদের জীবন কি ভরে উঠবে না উদ্যম ও প্রাণশক্তিতে?!

---

৭০. সহিহ বুখারি, হাদিস নং-১১৪২, ৩২৬৯ ও সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-৭৭৬।

আগেকার যুগে আমরা দেখতাম—সকল মানুষ অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে জেগে উঠত। কৃষক, ব্যবসায়ী, শ্রমিক, মজুর সবাই খুব সকালে তাদের কর্মক্ষেত্রে যেত। শিক্ষার্থীরা ভোরে উঠেই বই নিয়ে বসে পড়ত। তারপর আমাদের যাপিত জীবনে যুক্ত হলো টেলিভিশন, ভিডিও, স্যাটেলাইট চ্যানেল, (মোবাইল ফোন,) কফিশপ ও সাইবার ক্যাফে। ফল কী হলো?

দীর্ঘ রাত জেগে থাকা, দেরি করে ঘুমানো, দেরি করে জাগা এবং ভোরের প্রথম প্রহরের বরকতপূর্ণ সময়গুলো হেলায় হারানো।

সকল স্থান থেকে বরকত চলে গেছে। উৎপাদন কমে গেছে, অর্থনৈতিক সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে।

বরকত ফিরে পাওয়ার আর কোনো পথ নেই। পথ একটাই—আমাদের পুরোপুরি প্রত্যাবর্তন করতে হবে শরিয়তের দিকে, গুরুত্ব দিতে হবে শরিয়তের প্রতিটি বিধানকে। কাজে লাগাতে হবে ফজরের পূর্ব থেকে নিয়ে ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত পুরো দিনকে। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন মুসলিম উম্মাহকে প্রত্যুষের বরকতে সিক্ত করেন।

* * *

সালাফ ও পূর্বসূরিদের দৃষ্টিতে ফজরের নামাজ।

ফজরের নামাজের উল্লিখিত বিশেষ ফজিলতসমূহ ও অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহের কারণে এবং বিশেষ করে ফজরের জামাতের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের কারণে সালাফের কাছে ফজরের নামাজের এবং ফজরের জামাতের সবিশেষ গুরুত্ব ছিল। তারা তাদের জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ এই নেক আমলটির মূল্যমান অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। এ কারণেই তাদের জীবনে না কখনো ফজরের নামাজ কাজা হয়েছে, না কোনো মুসলমানের ফজরের নামাজ কাজা হতে পারে—এই সম্ভাবনা তাদের চিন্তাজগতে উদিত হয়েছে।

ইমাম মালিক রহ. তার '*মুআত্তা মালিক*' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. একদিন (মাত্র এক দিন!) ফজরের জামাতে তাবেয়ি সুলায়মান বিন হাছমা রহ.-কে দেখতে পেলেন না। দিনের বেলা তিনি বাজারে যাচ্ছিলেন। সুলায়মানের বাসস্থান ছিল বাজার ও মসজিদে নববির মাঝে। উমর রাযি. যখন সুলায়মানের মা শিফার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাকে বললেন, 'সুলায়মানকে তো আজ ফজরে দেখলাম না!' সুলায়মানের মা উত্তর দিলেন, 'সে রাত জেগে নামাজ পড়েছিল বলে (সারা রাত টেলিভিশন দেখেছিল বলে নয়!) ভোরে ঘুম চেপে বসেছিল।' উমর রাযি. বললেন, 'পুরো রাত জেগে নামাজ আদায়ের চেয়ে ফজরের জামাতে উপস্থিত হওয়া আমার কাছে অধিক প্রিয়।'

প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি.-এর ইন্তেকালের পর পরবর্তী খলিফা ও আমিরুল মুমিনিন হিসেবে উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.-এর হাতে সকলের বায়আত সম্পন্ন হয়েছিল মসজিদে নববিতে ফজরের নামাজের পরেই। সিদ্দিকে আকবার রাযি. সন্ধ্যায় ইন্তেকাল করেছিলেন এবং সন্ধ্যায়ই সমাধিস্থ হয়েছিলেন। পরের দিন ফজরের সময় উমর রাযি.-এর খেলাফতের বায়আত গ্রহণ করা হয়।

এর অর্থ হলো রাষ্ট্রের প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ, গভর্নর ও সেনাপতিগণ, উপদেষ্টা ও পরামর্শকগণ সকলেই ফজরের নামাজ জামাতে পড়তেন এবং ফজরের নামাজের সময়ই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করতেন। নিঃসন্দেহে তাদের এই সময়-নির্বাচন ছিল সম্পূর্ণ সঠিক ও যথাযথ। এর ফলে গৃহীত সিদ্ধান্তও হতো প্রজ্ঞাপূর্ণ।

সঠিক হবেই না বা কেন?! পরামর্শ করা হচ্ছে আল্লাহর ঘরে ফজরের নামাজের পর মোবারক সময়ে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে পবিত্র অবস্থায়।

এখান থেকেই আমরা এই রহস্যও উন্মোচন করতে পারি যে, কেন 'তারা' আল্লাহ পাকের নুসরত ও সাহায্য লাভ করতেন এবং কেন 'আমরা' লাভ করি না!

ইমাম মালিক রহ. *'মুআত্তা মালিক'* গ্রন্থে উল্লেখ করেন, মিসওয়ার বিন মিখরামা রহ. তাকে জানিয়েছেন, যেদিন ভোরে খলিফা উমর রাযি. আহত হন, তার পরবর্তী রাতে তিনি উমরের কাছে উপস্থিত হন এবং তাকে ফজরের নামাজের জন্য জাগ্রত করেন। উমর রাযি. ছিলেন ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান নেতা; তিনি তখন প্রাণঘাতী আঘাতে আহত হয়ে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। পরিস্থিতি বড় নাজুক। কিন্তু ফজরের নামাজে তো দেরি করা যাবে না! মিসওয়ার রহ. যখন উমর রাযি.-কে জাগ্রত করলেন, তখন তিনি কী বললেন?!

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, যে নামাজ তরক করে, ইসলামে তার কোনো হিস্‌সা নেই।' এরপর উমর রাযি. নামাজ আদায় করলেন। তখনও তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছিল!

এ কারণেই উমর-তনয় আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি. বলতেন, 'ফজরের নামাজের জামাতে কাউকে অনুপস্থিত দেখলে তার বিষয়ে আমরা অশুভ আশঙ্কা করতাম।'

হয়তো তার শরীর রোগাক্রান্ত, কিংবা তার দ্বীন আক্রান্ত!

ইবনে উমর তো প্রতিপালিত হয়েছেন হজরত উমরের তত্ত্বাবধানে! তিনি তো হবেন উমরের-ই সার্থক উত্তরসূরি!

যুগে যুগে মুসলিম উম্মাহর নেককার-বুজুর্গ বান্দাগণ ফজরের পূর্বে নয়; বরং ফজরের পরই কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতেন। তারা দিবসের প্রথম প্রহরের বরকত অর্জনে সচেষ্ট হতেন; জামাতে নামাজ আদায়ের পর আল্লাহর দরবারে দুশমনের বিরুদ্ধে সাহায্য চেয়ে কায়মনোবাক্যে দোয়া করতেন। এরপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। ফজরের সময় তো সংক্ষিপ্ত। ফজরের পূর্বেই যুদ্ধ শুরু করলে হয়তো নামাজ ছুটে যাবে! ফজরের ফজিলত ও ভোরের কল্যাণ ছুটে যাবে, এটা তারা কল্পনাও করতে পারতেন না।

আল্লাহ তাআলার কোষমুক্ত তরবারি হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি. ফজরের নামাজের পর ছাড়া অন্য সময় যুদ্ধ শুরু করতেন না।

মুরাবিতি সাম্রাজ্যের অধিপতি ও ইসলামি ইতিহাসের অন্যতম মহান সেনাপতি ইউসুফ বিন তাশফিন রহ. ঐতিহাসিক যাল্লাকার যুদ্ধের সময় আপন সৈন্যদের নিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করার পরই যুদ্ধ শুরু করেন।

সাইফুদ্দিন কুতুজ রহ. ঐতিহাসিক আইনে জালুতের যুদ্ধে তাতারিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন ফজরের নামাজ আদায়ের অব্যবহিত পরেই।

ইসলামের এই সব মহান কীর্তিপুরুষের কর্মদিবস সকাল ছয়টা-সাতটায় শুরু হতো না। তাদের কর্মসূচনা সংশ্লিষ্ট ছিল ফজরের নামাজের সঙ্গে।

সমগ্র মুসলিম বিশ্ব জেগে উঠত ফজরের নির্ধারিত সময়ে। পুরো পৃথিবীর কর্মধারা আবর্তিত হতো ফজরের নামাজকে কেন্দ্র করে; ফজরের নামাজ কোনো কিছু দ্বারা প্রভাবিত হতো না।

প্রত্যেক সফল মুসলিম সেনাপতির চিন্তা-চেতনাজুড়ে এসব নীতি ও মূলনীতি একেবারেই সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান ছিল।

বিশিষ্ট সাহাবি হজরত আনাস বিন মালিক রাযি. যখনই সুসতার নগরী[৭১] বিজয়ের কথা স্মরণ করতেন, তখনই কাঁদতেন।

---

৭১. সুসতার (Shushtar) বর্তমান ইরানের খুজিস্তান প্রদেশের অন্তর্গত একটি নগরী। প্রাদেশিক রাজধানী আহওয়ায থেকে প্রায় ৮১ মাইল উত্তরে অবস্থিত এই নগরীটি ১৭ হিজরি সনে মুসলিম বাহিনীর হাতে বিজিত হয়। সুসতার অভিযানেই বিখ্যাত পারস্য সেনাপতি হরমুযান মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দি হন। ফার্সিতে নগরীটির নাম شوشتر (শুশতার), আর=

সুসতার ছিল তৎকালীন পারস্য সাম্রাজ্যের অত্যন্ত সুরক্ষিত একটি নগরী। মুসলিম বাহিনী দীর্ঘ দেড় বছর অবরোধ করে রাখার পর নগরীটির পতন ঘটে এবং মুসলমানদের নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জিত হয়। সুসতারের অভিযান ছিল সে যুগের অন্যতম কঠিনতম অভিযান। স্বাভাবিকভাবেই এ বিজয় মুসলমানদের জন্য আনন্দ ও গৌরবের বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছিল। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে—তাহলে কেন হজরত আনাস রাযি. সুসতারের যুদ্ধের কথা স্মরণ হলেই কাঁদতেন?!

ফজরের নামাজের নির্ধারিত সময়ের সামান্য পূর্বে সুসতার নগরীর দুর্গ-দ্বার বিজিত হয়। মুসলিম বাহিনী স্রোতের ন্যায় দুর্গ-অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ত্রিশ হাজার মুসলিম মুজাহিদ আর দেড় লক্ষ পারসিক সৈন্যের মধ্যে শুরু হয় রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধ।

যুদ্ধের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল অত্যন্ত কঠিন।

প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর আশঙ্কা! চারিদিকে রক্ত, মৃত্যুর হাতছানি!

চূড়ান্ত পর্যায়ের কঠিন পরিস্থিতি! বড় সঙ্গিন মুহূর্ত!

কিন্তু আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহে শেষ পর্যন্ত মুসলিম বাহিনীর ভাগ্যেই বিজয়ের গৌরব লেখা হয়। মুসলমানরা পারসিকদের বিরুদ্ধে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। বিজয় অর্জিত হয় সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর!

হঠাৎ করেই মুসলিম অভিযাত্রীগণ আবিষ্কার করে যে, এই ভয়াবহ যুদ্ধের মধ্যেই তাদের সেদিনের ফজরের নামাজ কাজা হয়ে গেছে!

লড়াইয়ের চরম সঙ্গিন মুহূর্তে উন্মুক্ত তরবারির নিচে যুদ্ধ করার সময় মুসলিম বাহিনীর সদস্যগণ সেদিনের ফজরের নামাজ সময়মতো আদায় করতে পারেনি!

হজরত আনাস রাযি.-এর জীবনে এই এক দিনই ফজরের নামাজ ছুটে গিয়েছিল। শরিয়তের দৃষ্টিতে তিনি সেদিন অপারগ ও ক্ষমাযোগ্য ছিলেন।

=আরবিতে تُستَر (তুসতার)। সুসতারের অভিযান ইসলামি বিজয়াভিযানের ইতিহাসে অন্যতম সুকঠিন ও রোমাঞ্চকর অভিযান। এর বিস্তারিত বিবরণ জানতে পাঠ করতে পারেন মাকতাবাতুল হাসান থেকে প্রকাশিত—*ইসলামি ইতিহাস সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড। [অনুবাদক]

মুসলিম বাহিনীর সকল সদস্য সেদিন অপারগ ছিল। সকলে ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া নিয়ে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু যা ছুটে গেছে, তা যে অনেক মহান! অনেক গুরুত্বপূর্ণ এক আমল!

তুসতার অভিযানের কথা স্মরণ হলেই হজরত আনাস রাযি. অশ্রুসিক্ত হতেন। তিনি বলতেন, 'তুসতার কী?! আমার তো ফজরের নামাজ ছুটে গেছে। আমি এই নামাজের বিনিময়ে আমার জন্য পুরো পৃথিবীকেও পছন্দ করব না।'

প্রিয় পাঠক, আশা করি উপলব্ধি করতে পেরেছেন, কেন তাদের জন্য নেমে আসত আসমানি নুসরত ও গায়েবি সাহায্য!

﴿إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

> তোমরা যদি আল্লাহ (তাআলার দ্বীন)-এর সাহায্য করো, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদম অবিচলিত রাখবেন। [সুরা মুহাম্মাদ : ০৭]

ফজরের নামাজ যদি হয়ে থাকে নুসরত ও সাহায্যপ্রাপ্তির অন্যতম কার্যকারণ, তাহলে আল্লাহর শপথ দিয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করছি—আমাকে বলুন, যে জাতি ফজরের নামাজে অবহেলা ও শিথিলতা প্রদর্শন করে, কীভাবে আল্লাহ তাদের বিজয় দান করবেন?!

ফজরের সময় ঘুমিয়ে থেকে বিজয়ের স্বপ্ন দেখা?! আল্লাহর শপথ! এ তো অসম্ভব! এ তো অলীক দিবাস্বপ্ন!

যদি মুসলিম অভিযাত্রীদলের সদস্যগণ হয় আনাসি চেতনায় প্রতিপালিত; এক ওয়াক্ত ফজর ছুটে গেলেও যদি তাদের হৃদয়জগতে অস্থিরতা ও আলোড়ন সৃষ্টি হয়, তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহ তাআলার নুসরত ও সাহায্য লাভ করবে, অবশ্যই তারা হবে বিজয়ী।

﴿وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করবেন, যারা তার (দ্বীনের) সাহায্য করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী। [সুরা হাজ্জ : ৪০]

ফজরের নামাজ সহজে জামাতে আদায়ের জন্য সুনির্ধারিত কিছু উপায় ও মাধ্যম

প্রিয় পাঠক, দীর্ঘ আলোচনায় আপনার সামনে ফজরের নামাজের অনন্য ফজিলত ও বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব ও স্বাতন্ত্র্য এবং সালাফের রীতি ও কর্মনীতি তুলে ধরা হলো। উদ্দেশ্য এই নয় যে, এর মাধ্যমে আমাদের জ্ঞানের ভান্ডার সমৃদ্ধ হবে কিংবা ফজরের তাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে; কিন্তু আমাদের যাপিত জীবনে এর কোনো প্রতিফলন থাকবে না। আমরা এ সবকিছু কেবল এ উদ্দেশ্যে আলোচনা করেছি যে, আমরা আল্লাহ তাআলার এই সুমহান বিধান নিজেদের জীবনে বাস্তবায়নের চেষ্টা করব, আল্লাহর এই ফরজ বিধানের প্রতি পরিপূর্ণ যত্নশীল হব এবং যারা দ্বীনের সঠিক ও বিশুদ্ধ মর্ম উপলব্ধি করেছেন, সেই সালাফে সালিহিন ও বুজুর্গ পূর্বসূরিদের যথার্থ অনুসরণ করব।

আমরা চাই—ফজরের নামাজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে এবং দ্বীন ও শরিয়তের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের ক্ষেত্রে আমরা উমর, আনাস, সখর প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর আদর্শ উত্তরসূরি হব।

আমরা যদি ফজরের নামাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, বৈশিষ্ট্য ও কার্যকারিতা উপলব্ধি করে থাকি, তাহলে আমাদের পরবর্তী কর্তব্য হলো বাস্তব জীবনে ফজরের প্রতি পূর্ণ যত্নশীল হওয়া।

কীভাবে আমরা ফজরের নামাজের প্রতি যত্নবান হব?!

সামনে আমরা জামাতে ফজরের নামাজ আদায় সহজ হওয়ার দশটি উপায় ও মাধ্যমের কথা আলোচনা করছি। মনে রাখতে হবে, মাধ্যম এই দশটিতেই সীমাবদ্ধ নয় এবং সব মাধ্যম সবার জন্য সমান উপযোগী নয়। আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য—আপন আপন জীবনে এগুলো কাজে লাগানোর পাশাপাশি এমন আরও উপায় ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করা, যা আমাকে আল্লাহর বিধান পালন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

আল্লাহ তাআলা তাওফিক দান করুন! আল্লাহ পাক কবুল করুন!

প্রথম মাধ্যম

ইখলাস ও একনিষ্ঠতা

ইখলাস ও একনিষ্ঠতা হলো ফজরের নামাজ আদায়ের জন্য শয্যাত্যাগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ও সহায়ক উপাদান।

ইখলাস ব্যতিরেকে কেউ নিয়মিত এই গুরুত্বপূর্ণ নামাজ আদায় করতে পারবে না। আমরা পূর্বেও উল্লেখ করে এসেছি যে, প্রকৃতপক্ষে ফজরের নামাজ হলো মুখলিস ও মুনাফিক তথা নিষ্ঠাবান বান্দা ও কপট বান্দার মাঝে পার্থক্যকরণের মানদণ্ড।

আমলে ইখলাস সৃষ্টি হয় আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার প্রবল বাসনা এবং এক্ষেত্রে সব ধরনের ত্যাগ ও কোরবানি করতে প্রস্তুত হওয়ার মাধ্যমে।

অপরদিকে ইখলাস ও একনিষ্ঠতা কখনই সৃষ্টি হবে না, যদি মহান আল্লাহ তাআলার যথাযথ মর্যাদাবোধ কোনো ব্যক্তির হৃদয়ে না থাকে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

﴿وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِينَ ○ بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِينَ ○ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۖ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِينِهِ ۚ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

বাস্তব কথা হলো, তোমাকে ও তোমার পূর্বের নবীগণকে ওহির মাধ্যমে বলে দেওয়া হয়েছিল, তুমি যদি শিরক করো, তবে তোমার সমস্ত কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং তুমি আল্লাহর-ই ইবাদত করো এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত থাকো। তারা আল্লাহর মর্যাদা যথোচিতভাবে উপলব্ধি করল

না, অথচ কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তার মুঠোর ভেতর এবং আকাশমণ্ডলী গুটানো অবস্থায় থাকবে তার ডান হাতে। তিনি পবিত্র এবং তারা যে শিরক করে তা থেকে তিনি বহু ঊর্ধ্বে।

[সুরা যুমার : ৬৫-৬৭]

লক্ষ করুন, আয়াতে বলা হয়েছে, যখন বান্দা আল্লাহ তাআলার যথাযথ মর্যাদা উপলব্ধি না করে, তখনই শিরকের মতো গর্হিত গুনাহে লিপ্ত হয়। ইখলাস সৃষ্টি হবে যথোচিতভাবে আল্লাহ তাআলার মর্যাদা উপলব্ধির মাধ্যমে আর আল্লাহ তাআলার প্রতি প্রকৃত মর্যাদাবোধ সৃষ্টি হবে যদি তার পবিত্র কালাম আল-কুরআন গভীর ধ্যান ও মনোযোগের সঙ্গে তেলাওয়াত করা হয়, তার সৃষ্টিজগৎ ও ঊর্ধ্বলোকের প্রতি অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকানো হয়, তার নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করে তা নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা করা হয়।

প্রিয় পাঠক, ওপরের আলোচনায় অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটি বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আর তা হলো ফজরের নামাজ ছুটে যাওয়া মূলত স্বতন্ত্র কোনো রোগ নয়; বরং ঈমানসংহারক জটিল এক রোগের সুস্পষ্ট লক্ষণ! ফজরের প্রতি উদাসীন হওয়ার অর্থ হলো আপনি আল্লাহ তাআলাকে অতি তুচ্ছ সত্তা হিসেবে বিবেচনা করছেন! তাই তার প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছেন না, তার আদেশ পালনে একনিষ্ঠ হচ্ছেন না, তার নির্দেশের প্রতি যত্নবান হচ্ছেন না, তার সতর্কবাণীতে ভীত হচ্ছেন না, তার বিধি-বিধান অনুসরণ করছেন না এবং তার শরিয়ত অবনত মস্তকে বরণ করে নিচ্ছেন না।

এ কারণেই আপনি ফজরের নামাজ ছেড়ে দিচ্ছেন। নিঃসন্দেহে এটি ইখলাসশূন্যতার এক ভয়াবহ নিদর্শন।

আরেকটি সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ করুন।

এক সপ্তাহ, এক মাস বা এক বছর জামাতের সঙ্গে ফজরের নামাজ আদায়ের অর্থ এই নয় যে, আপনি আল্লাহ তাআলার মুখলিস বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন। বরং প্রকৃত ইখলাসের দাবি করতে হলে আপনাকে নিয়মিত ফজর আদায়ে যত্নবান হতে হবে। যেদিন আপনি ফজরের নামাজের প্রকৃত মূল্য ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছেন, সেদিন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আপনাকে হতে হবে ফজরের জামাতের নিয়মিত মুসল্লি।

বুঝতেই পারছেন, এর জন্য প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা ও মোজাহাদা এবং অব্যাহত ধৈর্য ও অনুশীলন।

যে ব্যক্তি কিছুদিন নিয়মিত নামাজ আদায় করে, তারপর আবার নামাজ ছেড়ে দেয়, সে আল্লাহ তাআলার প্রতি একনিষ্ঠ ও আন্তরিক নয়। আফসোসের বিষয়, অনেক মুসলমান এমন আছে, যারা জীবনের কিছু সময় মসজিদে নিয়মিত নামাজ আদায় করে; এরপর বছরের পর বছর তা ছেড়ে দেয়। যদি তারা বাস্তবেই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নামাজ আদায় করে থাকে, তাহলে তাদের জানা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা চিরঞ্জীব, আল্লাহর মৃত্যু নেই! আমরা এক দিন আল্লাহর ইবাদত করব, এক দিন করব না, কোনো পরিস্থিতিতে করব, কোনো পরিস্থিতিতে করব না—এমনটা কাম্য নয়। আমাদের কর্তব্য হলো সারা জীবন আল্লাহর ইবাদত করা, সব ধরনের পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা।

আজকের মুসলিম সমাজে আমরা কী দেখছি? কোথায় ইখলাস ও আন্তরিকতা?! কোথায় নিয়মিত ফজরের নামাজ আদায়ের নিষ্ঠাপূর্ণ প্রচেষ্টা?!

মুসলিম সমাজে তো আজ ইখলাসশূন্যতার ভয়াবহ সব নমুনা!

কয়েকটি দৃষ্টান্ত অবলোকন করুন।

[দৃষ্টান্ত এক]

একজন দাঈ ও দ্বীনপ্রচারক। মানুষকে কল্যাণের পথে আহ্বান করেন, তাদেরকে কুরআন-সুন্নাহ শিক্ষা দেন এবং তাদেরকে ইবাদতে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি নিজে নিয়মিত ফজরের জামাতে উপস্থিত হন। কারণ, তার আহ্বানে অন্যরা নেক আমল করবে আর তিনি নিজে তা থেকে বিরত থাকবেন, তা কী করে হয়!

এই মহান দাঈ ব্যক্তিই যখন পরিচিত সমাজ থেকে দূরে থাকেন, সফর বা অন্য কোনো কারণে অপরিচিত কোনো পরিবেশে থাকেন, তখন তার দ্বীনপ্রচারও বন্ধ থাকে। পরিতাপের বিষয়, তখন তিনি ফজরের জামাতেও অনুপস্থিত থাকেন!

তাহলে কোথায় ইখলাস! কোথায় একনিষ্ঠতা!

[দৃষ্টান্ত দুই]

একজন কর্মজীবী মুসলমান কর্মস্থলের পরিস্থিতির দাবিতে খুব ভোরে ফজরের ওয়াক্তে ঘুম থেকে উঠতে বাধ্য হতো। কিংবা একজন শিক্ষার্থী তার পরীক্ষার দিনগুলোতে সারা রাত পাঠ পুনঃঅধ্যয়ন করে ভোরে সামান্য ঘুমাত। দুজনই ফজরের নামাজ আদায়ের সুযোগ পাওয়ায় যথাসময়ে ফজরের নামাজ আদায় করত।

কিছুদিন পর প্রথমজনের কর্মস্থলের রুটিন পরিবর্তন হয়ে গেল, শিক্ষার্থীটির পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ায় অধ্যয়নের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। এখন দুজনের একজনকেও ফজরের জামাতে দেখা যায় না!

তাহলে কোথায় ইখলাস! কোথায় আন্তরিকতা!

[দৃষ্টান্ত তিন]

আরেকজন মুসলমান কঠিন এক সংকটে নিপতিত। তার পুত্র গুরুতর অসুস্থ, অথবা তার চাকরি চলে গেছে কিংবা সে কোনো জালিমের অন্যায় হস্তক্ষেপের শিকার হয়েছে। তার মন বড় ভারাক্রান্ত। সে নিজেকে মহান আল্লাহ তাআলার মুখাপেক্ষী মনে করে নিয়মিত ফজরের নামাজ আদায় করা শুরু করে। প্রতিদিন পূর্ণ একাগ্রতা ও বিনম্রচিত্তে ফজরের নামাজ আদায় করে, বিনয়ের সঙ্গে দোয়ায় কান্নাকাটি করে।

কিছুদিন পর মহান আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহে তার বিপদ কেটে গেল এবং সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। তারপর থেকে প্রথম কাতারের সেই নিয়মিত মুসল্লিকে ফজরের জামাতে মসজিদে খুঁজে পাওয়া যায় না!

তাহলে কোথায় ইখলাস! কোথায় একাগ্রতা!

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন—

﴿هُوَ الَّذِىْ يُسَيِّرُكُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ حَتّٰۤى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ ۚ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَآءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ

هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ۝ فَلَمَّآ اَنْجٰىهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ ۗ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ ۙ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۫ ثُمَّ
اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

তিনি তো আল্লাহ-ই, যিনি তোমাদেরকে স্থলেও ভ্রমণ করান এবং সাগরেও। এভাবে তোমরা যখন নৌকায় আরোহণ করো আর নৌকাগুলো মানুষকে নিয়ে অনুকূল বাতাসে পানির ওপর বয়ে চলে এবং তারা তাতে আনন্দ-মগ্ন হয়ে পড়ে, তখন হঠাৎ তাদের ওপর দিয়ে তীব্র বায়ু প্রবাহিত হয়, সব দিক থেকে তাদের দিকে তরঙ্গ ছুটে আসে এবং তারা মনে করে, সবদিক থেকে তারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে, তখন তারা খাঁটি মনে কেবল আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে শুধু তাকেই ডাকে এবং (বলে, হে আল্লাহ,) তুমি যদি এর (অর্থাৎ এই বিপদ) থেকে আমাদের মুক্তি দাও, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব। কিন্তু আল্লাহ যখন তাদেরকে মুক্তি দান করেন, তখন অবিলম্বেই তারা জমিনে অন্যায়ভাবে অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। হে মানুষ, প্রকৃতপক্ষে তোমাদের এ অবাধ্যতা খোদ তোমাদেরই বিরুদ্ধে যাচ্ছে। সুতরাং তোমরা পার্থিব জীবনের মজা লুটে নাও। শেষ পর্যন্ত আমারই নিকট তোমাদের ফিরতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে তোমরা যা-কিছু করছ, তা অবহিত করব।

[সুরা ইউনুস : ২২-২৩]

[দৃষ্টান্ত চার]

একজন মুরব্বিকে চিনি, যিনি পশ্চিমা এক রাষ্ট্রে ভালো বেতনে একটি মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজেই ইমামতি করতেন। নামাজ ছাড়াও তিনি মুসল্লিদের দ্বীনি বিষয়ে পাঠদানও করতেন।

এক বছর দায়িত্ব পালন করার পর তার চাকরি নবায়ন না হওয়ায় তিনি বাধ্য হয়ে সে এলাকাতেই অন্য একটি চাকরি নিতে বাধ্য হন। তার নতুন আবাসস্থল মসজিদের নিকটে হলেও এখন আর তিনি মসজিদে ফজরের

নামাজে উপস্থিত হন না; বরং অধিকাংশ নামাজেই তাকে মসজিদে দেখা যায় না!

তিনি এতদিন ইমামতি করতেন একটি পেশা ও চাকরি হিসেবে। চাকরি শেষ, তো জামাতের নামাজও শেষ!

তাহলে কোথায় ইখলাস! কোথায় 'সবকিছু এক আল্লাহর জন্য'!

প্রিয় পাঠক, ইখলাস হলো ফজরের নামাজ যথাসময়ে নিয়মিত আদায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম; বরং প্রতিটি নেক আমল ও ইবাদতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শয়তান আল্লাহ তাআলার মুখলিস বান্দাগণ ব্যতীত সকলকেই বিভ্রান্ত করতে পারে।

মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বিতাড়িত শয়তানের বিবরণ দিতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন—

﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾

সে বলল, তবে আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি তাদের সকলকে বিপথগামী করে ছাড়ব; তবে আপনার খাঁটি-মুখলিস বান্দাদের ছাড়া।

[সুরা সোয়াদ : ৮২-৮৩]

সুতরাং সাবধান! ইখলাসের অস্ত্রে সজ্জিত হোন! শয়তানের ফাঁদ থেকে আত্মরক্ষা করুন!

দ্বিতীয় মাধ্যম

দৃঢ় সংকল্প

এ বিষয়ে আমার পূর্ণ প্রত্যয় আছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি আন্তরিকভাবেই ফজরের নামাজের জন্য জাগ্রত হতে চায়, তাহলে কোনো বাধাই তাকে কক্ষনো দমিয়ে রাখতে পারে না।

বর্তমান সমাজের মুসলমান যদি প্রকৃত অর্থেই জামাতে ফজরের নামাজ আদায়ের প্রকৃত গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারত, তাহলে ফজরের নামাজ আদায় করার জন্য সে তার পুরো জীবনধারাকেই নতুন করে বিন্যস্ত করত।

দেখুন, মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে মুনাফিকদের সম্পর্কে কী ইরশাদ করেছেন—

﴿وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ﴾

যদি বের হওয়ার ইচ্ছাই তাদের থাকত, তবে তার জন্য কিছু না কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করত। কিন্তু তাদের ওঠাই আল্লাহর পছন্দ ছিল না। তাই তিনি তাদেরকে আলস্যে পড়ে থাকতে দিলেন এবং বলে দেওয়া হলো, যারা (পঙ্গুত্বের কারণে) বসে আছে, তাদের সঙ্গে তোমরাও বসে থাকো। [সুরা তাওবা : ৪৬]

সুতরাং প্রথমে প্রয়োজন সদিচ্ছার। যদি তারা বাস্তবেই আন্তরিকভাবে অভিযানে বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তাহলে অবশ্যই এমন কোনো উপযুক্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করত, যার ফলে বাস্তবে বের হওয়া সম্ভব হয়। একই কথা প্রযোজ্য ফজরের নামাজের ক্ষেত্রেও। যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ আদায় করতে চায়, সে যদি এর জন্য যথার্থ প্রস্তুতি গ্রহণ না করে, তাহলে তার এ দাবি সত্য নয় যে, আমি ফজরের নামাজ পড়তে চাই; কিন্তু তাওফিক হয় না।

উদাহরণস্বরূপ কেউ যদি দেরি করে ঘুমায়, ফজরের ওয়াক্তের জন্য ঘড়িতে অ্যালার্ম ও সতর্কধ্বনি না দিয়ে রাখে, জাগ্রত হওয়ার অন্য কোনো মাধ্যম গ্রহণ না করে, তাহলে সে কিভাবে এ দাবি করতে পারে যে, আমি ফজর তো পড়তে চাই; কিন্তু আজানই শুনতে পাই না!

যদি নিষ্ঠাপূর্ণ সংকল্প না থাকে, তাহলে আজান শোনার আশাও নেই!

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ﴾

> আল্লাহর যদি জানা থাকত যে, তাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ আছে, তবে তিনি তাদেরকে অবশ্যই শোনার তাওফিক দিতেন।
>
> [সুরা আনফাল : ২৩]

এ আয়াতের মর্মার্থ প্রযোজ্য ফজরের ক্ষেত্রেও। কোনো দুর্বল সংকল্পের অধিকারী মুসলমান যদি ফজরের আজান শুনতেও পেত, সে কিছুতেই নামাজ আদায় করত না!

এর চেয়েও ভয়াবহ বিষয় হলো, কখনো একজন মুসলমান এমন নিম্ন স্তরেও পৌঁছে যায় যে, নামাজ দূরে থাক, আল্লাহ তাআলা তার জাগ্রত হওয়াকেই অপছন্দ করেন!

হ্যাঁ, প্রিয় পাঠক, আল্লাহ তাআলা যখন কাউকে নামাজের প্রতি উদাসীনতায় অবিচল দেখতে পান, সংকল্পে নিস্তেজ ও অবসন্ন পান, অবাধ্যতার সুস্পষ্ট অভিপ্রায় প্রত্যক্ষ করেন, তখন আল্লাহ তার জাগ্রত হওয়াকেও অপছন্দ করেন। আল্লাহ তাআলা চান না, যে বান্দা তার কাছে আসবে, সে বাধ্য ও নিরুপায় হয়ে নিতান্ত অনিচ্ছায় আসুক। তিনি এমন বান্দাকেই পছন্দ করেন, যে প্রবল আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে তার আনুগত্য করে, শাওক ও তামান্না নিয়ে তার ডাকে 'লাব্বাইক' বলে।

আল্লাহ তাআলা যখন কারও মাঝে সংকল্পের দুর্বলতা পান, তখন নামাজের জন্য বা অন্য যেকোনো নেক আমলের জন্য তার উত্থানকে অপছন্দ করেন; বরং তাকে নেক আমল হতে হতোদ্যম ও নিবৃত্ত করে দেন!

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾

কিন্তু তাদের ওঠাই আল্লাহর পছন্দ ছিল না। তাই তিনি তাদেরকে আলস্যে পড়ে থাকতে দিলেন এবং বলে দেওয়া হলো, যারা (পঙ্গুত্বের কারণে) বসে আছে, তাদের সঙ্গে তোমরাও বসে থাকো।
[সুরা তাওবা : ৪৬]

সুতরাং হে আমার দ্বীনি ভাই, নিজের অবস্থা পুনঃমূল্যায়ন করুন। গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, আপনার মাঝে ইবাদতের যাওক-শাওক ও রুচি-আগ্রহ আছে কি-না?!

আপনি যদি ফজরের নামাজে অনুপস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে থাকেন, তাহলে সাবধান হোন। আপনি যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত না হন, আল্লাহ পাক যাদের জাগ্রত হওয়াকে অপছন্দ করে অলসতা, অবসন্নতা ও দুর্বলতায় আক্রান্ত করে দেন।

এরপর আপনার প্রতি আমার কল্যাণকামিতার দাবি হলো, ফজরের নামাজে অনুপস্থিত ব্যক্তিদের আধিক্যে প্রভাবিত হবেন না।

হজরত হোযায়ফা রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

«لَا تَكُونُوا إِمَّعَةً، تَقُولُونَ : إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا، وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا؛ وَلَٰكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا»

তোমরা অন্ধ অনুকরণশীল হয়ো না যে, তোমরা বলবে, লোকেরা সদ্ব্যবহার করলে আমরাও সদ্ব্যবহার করব; তারা যদি অন্যায় আচরণ করে, আমরাও অন্যায় আচরণ করব। বরং তোমাদের হৃদয়ে এ কথা গেঁথে নাও যে, লোকেরা সদাচরণ করলে তো সদাচরণ করবেই, তারা অন্যায় আচরণ করলেও তোমরা তাদের সঙ্গে অসদাচরণ করবে না।[৭২]

---

৭২. *জামে তিরমিজি*, হাদিস নং-২০০৭।

সুতরাং নিজেকে আমলবিমুখ এসব মানুষের সঙ্গে তুলনা না করে তুলনা করুন নবীজির প্রিয় সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে।

নিজেকে তুলনা করুন আনাস বিন মালিক রাযি.-এর সঙ্গে, যিনি মাত্র এক দিনের ফজরের নামাজ ছুটে যাওয়ায় বারবার অশ্রুসিক্ত হতেন।

নিজেকে তুলনা করুন খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি., কা'কা' রাযি., ইউসুফ বিন তাশফিন রহ. ও সাইফুদ্দিন কুতুজ রহ.-এর সঙ্গে।

মনোবল উন্নত করুন, আদর্শ ও নমুনা মহান করুন, লক্ষ্য বড় করুন এবং আশা ও প্রত্যাশার পারদ উঁচু করুন।

আপনার প্রতি আমার আরও অনুরোধ—আপনি কেবল ফজরের নামাজের হিসাব রাখার জন্য একটি ফরম তৈরি করুন। তাতে বছরের সবগুলো মাসের নাম লিপিবদ্ধ করুন; প্রতিদিনের জন্য ঘর তৈরি করুন। যেদিন আপনি ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করতে সক্ষম হন, সেদিনের পাশে একটি 'টিক চিহ্ন' দিন আর যেদিন ফজরের নামাজ জামাতে আদায়ে সক্ষম না হন, সেদিনের পাশে দিন 'কাঁটা চিহ্ন'। এরপর মাস-শেষে নিজের অবস্থা যাচাইয়ের জন্য পুরো মাসের তালিকায় চোখ বোলান। আপনি নিজেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, আপনার জীবন সঠিক পথে পরিচালিত হচ্ছে, না-কি ভুল পথে?

মনে রাখবেন, বিষয়টি রসিকতার বা হেলায় তুচ্ছ ভাবার নয়; এটি আপনার জীবনের সাফল্য-ব্যর্থতার হিসাব।

হজরত উমর রাযি. বলেন,

«حَاسِبُوْا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوْا، وَزِنُوْا أَعْمَالَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوْزَنَ عَلَيْكُمْ، وَتَزَيَّنُوْا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ يَوْمَ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ»

তোমাদের হিসাব নেওয়ার পূর্বেই নিজেরা নিজেদের হিসাব নাও, তোমাদের আমল ওজন করার পূর্বেই নিজেরা নিজেদের আমল ওজন করে নাও আর সেদিনের মহা উপস্থিতির জন্য (আমলে) সজ্জিত হও, যেদিন তোমাদের কোনো গোপন বিষয় গোপন থাকবে না।

তৃতীয় মাধ্যম

গুনাহ পরিহার

ফজরের নামাজ হলো মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এক উপঢৌকন, যা কেবল অনুগত-তাওবাকারী বান্দাকেই দান করা হয়ে থাকে।

যে অন্তর আসক্ত পাপ-কামনায়, তা কীভাবে জাগ্রত হবে ফজরের নামাজের জন্য?!

যে হৃদয় আচ্ছাদিত গুনাহ-আবরণে, তা কীভাবে প্রভাবিত হবে ফজরের নামাজের ফজিলতের আলোচনায়?!

যে হৃদয় আসক্ত গুনাহে, আল্লাহর স্মরণে ও অবতীর্ণ সত্যের আহ্বানে কীভাবে তা বিগলিত হবে?!

গাফেল ও গুনাহগার কীভাবে শুনতে পাবে মুয়াজ্জিনের আহ্বান—

হাইয়া আলাস সালাহ! এসো নামাজের উদ্দেশ্যে!

হাইয়া আলাল ফালাহ! এসো কল্যাণের উদ্দেশ্যে!

আসসালাতু খাইরুম মিনান নাওম! নামাজ নিদ্রা হতে উত্তম!

হজরত আবু হোরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

«إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ، فَإِنْ زَادَ زَادَتْ، فَذٰلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ: [كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ]»

মুমিন ব্যক্তি যখন কোনো গুনাহ করে, তখন তার হৃদয়ে একটা কালো দাগ পড়ে যায়। অতঃপর যদি সে তাওবা করে এবং উক্ত কাজ ছেড়ে দেয় আর মাগফিরাত কামনা করে, তাহলে তার কলব পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। আর যদি সে আরও গুনাহ করে, তাহলে সেই কালো দাগ বেড়ে যায় (এমনকি সমগ্র অন্তর কালো দাগে ছেয়ে

যায়)। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে [সুরা তাতফিফ : ১৪] এই কালো দাগের কথাই জং বলে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে—'কখনো নয়; বরং তারা যেসব কাজ করছে, তা তাদের অন্তরে জং ধরিয়ে দিয়েছে।'(৭৩)

সুতরাং ফজরের নামাজ ছুটে যাওয়া একটি মুসিবত ও বিপদ। আর আল্লাহ তাআলা আপন কালামে পাকে ইরশাদ করেছেন—

﴿وَمَآ أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾

তোমাদের যে বিপদ দেখা দেয়, তা তোমাদের নিজ হাতের কৃতকর্মেরই কারণে দেখা দেয়। [সুরা শুরা : ৩০]

অতএব, অতি সূক্ষ্মভাবে আপনার জীবন নিয়ে ভাবুন, নির্ণয় করুন—কোন কোন গুনাহে আপনি আসক্ত ও অভ্যস্ত।

চোখের গুনাহ, জবানের গুনাহ, মানুষের সঙ্গে আচরণ ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুনাহ, মাতা-পিতার সঙ্গে সদাচরণের ক্ষেত্রে গুনাহ, অহংকার, অহমিকা, দম্ভ, হিংসা, ক্রোধ, কপটতা ইত্যাদি আত্মিক গুনাহ।

কোনো গুনাহকেই তুচ্ছ ও ছোট মনে করবেন না। হতে পারে, আপাতদৃষ্টিতে ছোট ও তুচ্ছ মনে করা এই গুনাহটির কারণেই আপনার ফজরের নামাজ ছুটে যাচ্ছে।

হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. বর্ণনা করেন—

«إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ»

তোমরা (আপাতদৃষ্টিতে) তুচ্ছ মনে করা গুনাহসমূহ হতে বেঁচে থাকো। কেননা, যখন এ জাতীয় গুনাহ কোনো মানুষের স্বভাবে সমবেত হয়ে যায়, তখন তা তাকে ধ্বংস করে ফেলে।(৭৪)

---

৭৩. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং-৪২৪৪ ও ইমাম আহমাদ, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং-৭৯৫২।

৭৪. ইমাম আহমাদ, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং-৩৮১৮, তাবারানি, আলমুজামুল কাবির, ৫/৪৪৯, ও বায়হাকি, শুআবুল ঈমান, হাদিস নং-৭০১৭।

সুতরাং এখনই গুনাহ পরিহার করুন, পূর্বে-কৃত গুনাহ ও অন্যায়ের জন্য বাস্তবেই অনুতপ্ত হোন এবং গুনাহমুক্ত জীবন গড়ুন। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করুন, ভবিষ্যতে কখনো কোনো অন্যায়ে লিপ্ত হবেন না। প্রত্যেকের অধিকার তাকে ফিরিয়ে দিন। আল্লাহ পাকের সঙ্গে জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করুন।

আপনি যদি নিষ্ঠা ও ইখলাসের সঙ্গে গুনাহমুক্ত নতুন জীবন শুরু করতে পারেন, তাহলে মহান আল্লাহ তাআলাও আপন দান-প্রতিদান ও কল্যাণের বারিধারা দ্বারা আপনাকে সিক্ত করবেন। দান করবেন শ্রেষ্ঠতম ফজিলতসমৃদ্ধ ইবাদত ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করার তাওফিক।

আল্লাহ তাআলার কাছে হেদায়েত ও তাওবা প্রার্থনা করছি আমার জন্য, আপনার জন্য এবং সকল মুসলমানের জন্য।

চতুর্থ মাধ্যম

দোয়া ও রোনাজারি

দোয়া নেক আমলের তাওফিক লাভের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম। সাবধান! একে মোটেও তুচ্ছ মনে করবেন না।

প্রতিদিন রুটিন বানিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। আল্লাহর কাছে ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করার তাওফিক ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করুন। দোয়া করুন এবং অনুনয়-বিনয় করুন।

স্মরণ করুন ও চিন্তা করুন—ফজরের নামাজের জন্য কে আপনাকে জাগিয়ে দেন?! বলা ভালো, ঘুমানোর পর কে আপনাকে ফজরের নামাজের সময় 'পুনরুজ্জীবিত' করেন?!

প্রকৃতপক্ষে নিদ্রা তো এক ধরনের মৃত্যু আর জাগ্রত হওয়া তো এক ধরনের পুনরুজ্জীবন!

দেখুন, মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে কী ইরশাদ করেছেন—

﴿اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰى اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ﴾

আল্লাহ রুহসমূহকে কবজ করেন তাদের মৃত্যুকালে, আর এখনও যার মৃত্যু আসেনি, তাকেও (কবজ করেন) তার নিদ্রাকালে। অতঃপর যার সম্পর্কে তিনি মৃত্যুর ফয়সালা করেছেন, তাকে নিজের কাছে রেখে দেন আর অন্যান্য রুহকে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ছেড়ে দেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে সে সকল লোকের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে। [সুরা যুমার : ৪২]

এ কারণেই নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শয্যাগ্রহণ ও শয্যাত্যাগের সময় পাঠ করার জন্য অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও গুরুত্বপূর্ণ দুটি দোয়া

শিক্ষা দিয়েছেন। দোয়াদুটিতে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে যে, ঘুম ও মৃত্যুর মাঝে এবং জাগ্রত হওয়া ও পুনরুজ্জীবনের মাঝে আছে বিরাট সাদৃশ্য। হজরত হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযি. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয্যাগ্রহণের সময় এই দোয়া পড়তেন—

«بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا»

আপনার-ই নাম নিয়ে আমি মারা যাই আর আপনার নাম নিয়েই জীবিত হই।

আর ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে পড়তেন—

«اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ»

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের (নিদ্রাজাতীয়) মৃত্যুদানের পর আবার আমাদের পুনর্জীবিত করেছেন। (অবশেষে) আমাদের তারই দরবারে মিলিত হতে হবে।[৭৫]

তাহলে যে আল্লাহ আমাদের রুহ ও আত্মা আপন কুদরতি কবজায় নিয়ে নেন, আমরা তার কাছে দোয়া করব যে, তিনি যেন ফজরের নামাজের সময় বা ফজরের নামাজের পূর্বে আমাদের রুহকে ছেড়ে দেন।

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করব, আল্লাহ যেন ঈমানকে আমাদের হৃদয়জগতে সুসজ্জিত করে দেন।

তিনি যেন আমাদের জন্য ইবাদত ও নেক আমল সহজ করে দেন।

তিনি যেন আমাদেরকে যথাসময়ে মসজিদে নামাজ আদায়ে সাহায্য করেন।

তিনি যেন আমাদের পদযুগলকে তার পথে অটল-অবিচল রাখেন; আমরা যেন স্খলন ও বিচ্যুতির শিকার না হই এবং প্রবৃত্তি ও শয়তানের অনুসরণ না করি।

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করব, তিনি যেন আমাদের মন ও মানসে তার শরিয়ত ও নির্দেশনাকে মহান ও গুরুত্বপূর্ণ করে দেন। আমরা যেন কক্ষনো তার অবাধ্যতা বা বিরোধিতা না করি।

---

৭৫. সহিহ বুখারি, হাদিস নং-৬৩১২।

আমরা সর্বদা দোয়া করব; নিয়মিত দোয়া করে যাব। দোয়া করব অনুনয়-বিনয় সহকারে; দোয়া করব বিশেষ করে দোয়া কবুল হওয়ার প্রসিদ্ধ সময়গুলোতে।

আমরা মহান ও দয়াময় সত্তা আল্লাহর কাছে তার নৈকট্য লাভের দোয়া করব আর তিনি আমাদেরকে দূরে ঠেলে দেবেন, এটা কি মোটেও যুক্তিযুক্ত?!

বান্দা যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করে, আল্লাহ অত্যন্ত খুশি হন। সুনিশ্চিত মৃত্যু হতে নিষ্কৃতি পেয়ে একজন মানুষ যতটা খুশি হয়, বান্দা যখন আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করে, তখন আল্লাহ তাআলা তার চেয়েও বেশি খুশি হন।

হজরত আবু হোরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

«اَللهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَه بِالْفَلَاةِ»

মরুভূমির নির্জন প্রান্তরে তোমাদের কেউ হারানো (বাহন) পশু ফিরে পেয়ে যে পরিমাণ খুশি হয়, আল্লাহ তাআলা বান্দার তাওবায় তার চেয়েও বেশি খুশি হোন।[৭৬]

পঞ্চম মাধ্যম

সৎ সাহচর্য

নেককারদের সোহবত ও সৎ সাহচর্য-ও নেক আমল সম্পাদনে অত্যন্ত সহায়ক ও গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুসঙ্গ। একা কারও পক্ষে নেক কাজ সম্পাদন করা কঠিন। যে একা একা চলে, শয়তান তাকে সহজে বশ করতে পারে।

হজরত উমর বিন খাত্তাব রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

«عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ»

তোমরা অবশ্যই মুসলিম জামাতকে আঁকড়ে থাকবে আর বিচ্ছিন্নতা পরিহার করবে। শয়তান একাকী জনের সঙ্গে থাকে। আর দুজন থেকে সে বহু দূরে থাকে। যে ব্যক্তি জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান কামনা করে, সে যেন জামাতকে আঁকড়ে থাকে।[৭৭]

হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

«يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ»

আল্লাহর হাত (সমর্থন) হলো জামাতের সঙ্গে। যে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, সে একাকী জাহান্নামে যাবে।[৭৮]

প্রিয় পাঠক, তাহলে একটু তাকিয়ে দেখুন, আপনার সঙ্গী কারা?!

আপনি যখন তাদের সঙ্গে থাকেন, তারা কি আপনাকে ফজরের নামাজ, কুরআন তেলাওয়াত, দৃষ্টির হেফাজত ও মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়?

---

৭৭. *জামে তিরমিজি*, হাদিস নং-২১৬৫।

৭৮. *জামে তিরমিজি*, হাদিস নং-২১৬৭।

তারা কি আপনাকে আল্লাহর জিকির ও ইবাদতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়? না-কি তারা এমন নয়?

যদি আপনার সঙ্গীরা আলোচনা করে খেলাধুলা, অন্যায়-অপ্রয়োজনীয় ও তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়ে; যদি তারা অভ্যস্ত থাকে সময় ও জীবন নষ্টে, তাহলে ভাবুন আপনার ও তাদের পরিণতি নিয়ে!

তাদের জন্য কল্যাণের দোয়া করুন। তাদেরকে কল্যাণ ও ইবাদতের প্রতি আহ্বান করুন। তারা যদি আপনার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে, আপনি আত্মরক্ষা করুন! বাঁচতে চাইলে অন্য সঙ্গী তালাশ করুন।

আপনাকে সৎ সাহচর্য গ্রহণ করতে হবে। কারণ, সঙ্গীদের ধর্ম ও ধর্মাচারই আপনার ধর্ম ও ধর্মাচার! আবু হোরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

«اَلْمَرْءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِه، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ»

মানুষ তার বন্ধুর রীতি-নীতির অনুসারী হয়ে থাকে। সুতরাং লক্ষ করবে, কে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে।(৭৯)

হায়! কত ভালো হতো, যদি কেবল সৎ সঙ্গীরাই আপনার চারপাশে বাস করত! আপনি যে মসজিদে নামাজ পড়েন, তারাও সে মসজিদে নামাজ পড়ত! আপনি যদি কোনোদিন নামাজে অনুপস্থিত থাকেন, তারা আশ্বস্ত হওয়ার জন্য আপনাকে খোঁজ করত! আপনাকে জিজ্ঞেস করত, 'ভাই, আজ নামাজে দেখলাম না যে!' আর আপনিও তাদের সঙ্গে এরূপ কল্যাণ আচরণ করতেন!

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অন্যকে সহযোগিতা করবে। গুনাহ ও জুলুমের কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করবে না। [সুরা মায়িদা : ০২]

ইতিপূর্বে আমরা পাঠ করেছি হজরত উমর রাযি. কীভাবে তার সঙ্গী সুলাইমান বিন আবু হাছামা রহ.-এর এক দিন নামাজে অনুপস্থিতির কারণে তার সম্পর্কে আশ্বস্ত হতে চেয়েছেন।

এটাই হলো সৎ সাহচর্যের দাবি।

সৎ সাহচর্যই মানুষকে সৌভাগ্যবান করে দুনিয়াতে ও আখিরাতে।

﴿ٱلۡأَخِلَّآءُ يَوۡمَئِذِۭ بَعۡضُهُمۡ لِبَعۡضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلۡمُتَّقِينَ﴾

সেদিন বন্ধুবর্গ একে অন্যের শত্রু হয়ে যাবে; কেবল মুত্তাকিগণ ছাড়া। [সুরা যুখরুফ : ৬৭]

আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদেরকে পার্থিব জীবনে সৎ সাহচর্যের নিয়ামত দান করেন এবং কাল কিয়ামতের দিন আমাদেরকে আমাদের সঙ্গীদের সঙ্গে ভাই-ভাইরূপে মুখোমুখি হয়ে সুউচ্চ আসনে সমাসীন করেন।

ষষ্ঠ মাধ্যম

জানতে হবে ঘুমের সঠিক পদ্ধতি!

আপনি হয়তো অবাক হয়ে ভাবছেন, ঘুমেরও আবার জটিল ও সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম-নীতি আছে না-কি?!

হ্যাঁ, প্রিয় পাঠক, ঘুমেরও নিয়ম আছে। শুধু ঘুম কেন, মুমিনের জীবনের প্রতিটি আচরণ ও উচ্চারণ, স্পন্দন ও আন্দোলনের জন্যই আছে সুনির্দিষ্ট নিয়ম-রীতি, সুন্নাতে নববি!

আমাদেরকে ঘুমের সঠিক পদ্ধতি জানতে হবে। আল্লাহ তাআলা ঘুমের যে পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পদ্ধতিতে শয্যাগ্রহণ করেছেন, তা-ই হলো ঘুমের সঠিক পদ্ধতি।

এবার জেনে নিন, ইসলামি বিধানসম্মত ও সুন্নাহসম্মত পদ্ধতির নিদ্রা কেমন।

[এক]

তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যাওয়া।

ইসলামি শিক্ষাবিমুখ এই সমাজে কত রকম ভ্রান্ত চিন্তা মানুষের মাঝে বাসা বেঁধেছে! অনেকে মনে করে, রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যাওয়া একটি মানসিক ব্যাধি! আবার অনেকে মনে করে, এটি ভালো, তবে কেবল শিশুদের জন্য!

না, এগুলো সবই ভ্রান্ত ধারণা। তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যাওয়া কোনো ব্যাধি বা ত্রুটি নয়; কেবল শিশুদের জন্যও প্রযোজ্য নয়। বরং আগে আগে শয্যাগ্রহণ করা সুন্নাতে ইলাহি ও মানুষের জন্য স্রষ্টা-নির্ধারিত স্বভাব-রীতি; পাশাপাশি তা প্রিয় নবীজির সুন্নাত। আজকের পৃথিবীর বুদ্ধিজীবী সমাজ ও চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের সম্মিলিত অভিমতও এই ধারণাকে সমর্থন করে। নিঃসন্দেহে এটি ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও চিরন্তনতার এক অনন্য দলিল।

আল্লাহ তাআলা পশু-পাখি, জলজ প্রাণীসহ পুরো সৃষ্টিজগৎকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, সকলে রাতে বিশ্রাম করে এবং দিনে জাগ্রত থাকে। মানুষও এই সৃষ্টিস্বভাবের বহির্ভূত নয়। এজন্য মানুষ যেমনই প্রত্যাশা করুক না কেন, আল্লাহ তাআলা প্রত্যুষে সূর্যকে আলোকিত করেন, যেন মানুষ জেগে ওঠে।

এরপর আল্লাহ তাআলা-ই রাতে সূর্যকে আলোহীন করে দেন, যেন মানুষ নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে। এটি আল্লাহ তাআলার অন্যতম সুস্পষ্ট নিদর্শন। অথচ তারপরও মানুষ বিরোধিতা করে!

অনেক মানুষ বিশেষ করে যুবকসমাজ মনে করে যে, তারা রাতে যত দীর্ঘ সময় জাগ্রত থাকতে পারবে, ততই তাদের তারুণ্য প্রস্ফুটিত হবে! নির্ঘুম রজনী আর নিদ্রাচ্ছন্ন দিবস কাটাতে পারলেই বুঝি সভ্য হওয়া যাবে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পাঠ আদায় হবে!

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন—

﴿اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الَّیْلَ لِتَسْكُنُوْا فِیْهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ

فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَشْكُرُوْنَ﴾

> আল্লাহ-ই তো, যিনি তোমাদের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পার আর দিনকে বানিয়েছেন দেখার জন্য। বস্তুত আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ লোক শোকর আদায় করে না। [সুরা মুমিন : ৬১]

আল্লাহ তাআলা-ই মানুষের দেহ সৃষ্টি করেছেন, তিনিই মানবদেহের কোষ ও গ্রন্থিসমূহে উদ্দীপক হরমোন সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলা মানুষের দেহপ্রক্রিয়া এমন পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করেছেন, যেন সে রাতে ঘুমায় এবং দিনে জেগে থাকে। মানুষ যখন এই মানবিক স্বভাব-চাহিদার বিপরীত চলে, তখন তার দেহযন্ত্র সঠিকভাবে কাজ করে না এবং স্বাভাবিক আচরণ করে না।

যারা মানুষের জন্য সুন্দর ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ তৈরি করতে মানবদেহ ও পৃথিবী নিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা করে যাচ্ছেন, তারাও এ বিষয়টি উপলব্ধি করেছেন। এ কারণেই তারা সকলে আগে আগে ঘুমাতে যাওয়ার এবং আগে আগে (ফজরের নামাজের নির্ধারিত সময়ে) শয্যাত্যাগের উপদেশ দিয়েছেন। গবেষকগণ দীর্ঘ গবেষণার পর যে সূত্র উদ্‌ঘাটনে সক্ষম হয়েছেন, পবিত্র কুরআন ও প্রিয় নবীজির সুন্নাত তা শত শত বছর পূর্বেই মুসলমানদের শিখিয়ে দিয়েছে। আফসোসের বিষয় হলো, 'তারা' তাদের গবেষণালব্ধ সূত্র নিজেদের

জীবনে বাস্তবায়ন করছে আর 'আমরা' হেলায় পাওয়া সম্পদ ছুড়ে ফেলে বসে আছি!

আমি নিজে পশ্চিমা দেশগুলোতে দেখেছি, সেখানকার অধিবাসীরা আমাদের মুসলমানদের ধারণার চেয়েও অনেক পূর্বে ঘুমিয়ে পড়ে। এটি সেখানে কোনো বিস্ময়কর তথ্য নয় যে, তাদের অধিকাংশই রাত আটটা থেকে নয়টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। রাত আটটা-নয়টার পর আপনি সেখানে খুব কম সংখ্যক লোককেই রাস্তায় চলতে দেখবেন!

এর অর্থ এই নয় যে, তাদের কাছে রাতজাগার বিভিন্ন উপকরণের অভাব আছে। বরং রাতজাগার সকল উপকরণ তাদের কাছে আছে এবং বেশি পরিমাণেই আছে। তাদের সমাজে টেলিভিশন, স্যাটেলাইট চ্যানেল, (ইন্টারনেট,) ক্যাসিনো, চব্বিশ ঘণ্টা খোলা দোকান-পাট, প্রমোদকেন্দ্র, রাত কাটানোর সঙ্গী-সাথি, বিনোদন-অনুষ্ঠান সবই আছে। কিন্তু জাগতিক স্বার্থের দাবি ও স্বাস্থ্য-সচেতনতার কারণে তারা তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে এবং প্রত্যুষে জেগে ওঠে। আর এই শৃঙ্খলিত নিদ্রারীতি তাদের পুরো জীবনধারাতেই ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে। তাদের সারাদিনের কাজ-কর্ম রুটিনমাফিক হয়, প্রতিটি কাজ ও প্রচেষ্টা কার্যকর ও সফল হয়, প্রত্যেকে উচ্ছল প্রাণোদ্যম ও প্রাণশক্তি নিয়ে কাজ করে।

আমি তাদের এই কর্মধারায় মুগ্ধ হয়ে এসব কথা বলছি না। আমি এই অসার দাবিও মানি না যে, এই সুসংহত নিদ্রারীতি পশ্চিমাদের আবিষ্কার। আমি এসব কথা এজন্য বলছি যে, আমার আফসোস লাগে, কুরআন-সুন্নাহয় উল্লেখিত এই অমূল্য সম্পদ আজ মুসলমানরা কাজে লাগাচ্ছে না, আগ্রহও দেখাচ্ছে না!

আমার প্রিয় ভাই-বোন, আজকের আমেরিকা, জাপান, চীন, জার্মানি, ইংল্যান্ড ও অন্যান্য উদ্যমী দেশের অধিবাসীরা যা করেছে, তা তো ইসলামেরই দাবি। এটি নতুন কোনো আবিষ্কার নয়, নয় কোনো অধুনাতন নিদ্রারীতি। তারা যে বস্তুগত উৎকর্ষ ও জীবনধারার নিয়ন্ত্রণ অর্জন করেছে, তা কেবল এ কারণেই যে, তারা পৃথিবীর জন্য স্রষ্টার সুনির্ধারিত স্বভাবরীতির অনুসরণ করেছে; বলা ভালো, সুন্নাতুল্লাহর অনুসরণ করেছে। আর সুন্নাতুল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি হলো, যে এই রীতি অবলম্বন করবে, সে মুমিন হোক বা ফাসিক কিংবা কাফির, সে আপন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে সক্ষম হবে।

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَوٰةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾

যারা (কেবল) পার্থিব জীবন ও তার ঠাটবাট চায়, আমি তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ ফল এ দুনিয়ায়ই ভোগ করতে দেবো এবং এখানে তাদের প্রাপ্য কিছু কম দেওয়া হবে না। [সুরা হুদ : ১৫]

প্রিয় পাঠক, এবার একটু ভেবে দেখুন—আপনি কেন রাতে দ্রুত শয্যাগ্রহণ করেন না? কেন আজকের মুসলিম জাতি নির্ঘুম রাত কাটায়?!

যারা নির্ঘুম রাত কাটায়, তাদের বড় একটা অংশ রাতের সময়টুকু টিভিপর্দার (বা মুঠোফোনের পর্দার) সামনেই কাটায়। অথচ সকলে জানে, এই রাতজাগার মধ্য দিয়ে ভালোর চেয়ে মন্দ অর্জন অনেক অনেক বেশি। অধিকন্তু এতে সময় নষ্ট ও বেকার প্রচেষ্টা তো আছেই।

আরেক দল বিভিন্ন কাজ করে রাত কাটায়। তারা যদিও আপাতদৃষ্টিতে ভালো কাজই করছে; কিন্তু এর ফলে তারা ভোরের বরকতের সময়টুকু থেকে বঞ্চিত হয়। কেননা, তারা কিছুতেই প্রত্যুষে ঘুম থেকে জাগতে পারে না।

বিনিদ্র রাত কাটানো আরেকটি বড় দল হলো শিক্ষার্থীদের। তারা রাত জেগে পড়া-শোনা করে। অথচ চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের সর্বসম্মত মত হলো মানুষের মেধা-মস্তিষ্ক সবচেয়ে বেশি ও কয়েকগুণ বেশি উদ্যমী ও কার্যকর থাকে দিনের প্রথম প্রহরে। তাই শিক্ষার্থীরা যদি মধ্যরাতের পর অধ্যয়নের পরিবর্তে ফজরের নামাজের পর অধ্যয়ন ও পাঠালোচনার অভ্যাস গড়ে তোলে, তাহলে তা তাদের জন্য হবে হাজার গুণ বরকতপূর্ণ।

সর্বশেষ একটি দল আছে যাদের অবস্থা সবার চেয়ে করুণ! তারা হলো সেসব যুবক ও তরুণ, যারা ফজরের সামান্য পূর্ব পর্যন্ত কফিশপ, ক্যাফটেরিয়া বা সাইবার-ক্যাফেতে সময় কাটায়। বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা করে, নানা ধরনের ড্রিংকস করে তারা জীবনের মূল্যবান সময়গুলো 'পার' করে। কেউ কেউ ভিডিও গেমস খেলে, কেউ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয় ইন্টারনেটের পর্দার সামনে, কেউ বা বিলিয়ার্ড খেলে রাত কাটায়। আবার কেউ কেউ রাস্তার কোণে দাঁড়িয়ে সিগারেট বা আরও ক্ষতিকর কোনো কিছু সেবনে ব্যস্ত থাকে। কেউ হয়তো এর চেয়েও গর্হিত ও অশ্লীল কোনো কাজে লিপ্ত থাকে।

পরিতাপের বিষয় হলো, এদের অধিকাংশই মুসলমান, মুসলিম পরিবারের সদস্য। বরং হয়তো কোনো মর্যাদাসম্পন্ন দ্বীনি পরিবারের সদস্য। আফসোস! সকলের দৃষ্টি যেন অন্ধ হয়ে গেছে, বিবেক অকার্যকর হয়ে গেছে, অন্তরজগৎ মলিন হয়ে গেছে। জানি না, কোথায় তাদের বাবা-মায়েরা? কোথায় শিক্ষক ও মুরব্বিরা? কোথায় সমাজের আহ্বায়ক ও সংস্কারকরা? এবং কোথায় শিক্ষা, সংস্কার, সংশোধন ও পুনর্বাসনের দায়িত্বশীলেরা?!

সমাজ-চরিত্রে কেন এই চরম অধঃপতন?

পৃথিবীর রীতি-নীতিতে কেন এই সর্বনাশা পরিবর্তন?

উম্মাহর অবস্থা পুনঃবিবেচনার জন্য একটি বিরতি গ্রহণের সময় কি এখনও হয়নি?!

উম্মাহর পরিস্থিতি মূল্যায়ন ও মূল্যবোধের অবনতির কারণ নিরূপণের জন্য ভাবার সময় কি এখনও হয়নি?!

যুবসমাজের অধঃপতনের কার্যকারণ নির্ধারণের জন্য জাতীয় গবেষণার প্রয়োজন কি এখনও তৈরি হয়নি?!

এটাই কি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন, ইসলামি শরিয়ত ও জীবনবিধান এবং সুন্নাতে রাসুলের প্রতি প্রত্যাবর্তনের সুবর্ণ সুযোগ নয়?!

এখন নয় তো কখন?! হয়তো এখন, নয়তো কখনো নয়!

প্রিয় মুসলিম জাতি, জেগে ওঠো! জেগে ওঠো গাফলতের দিবানিদ্রা হতে!

এই পরিবর্তিত জীবনধারা নিয়ে আমরা এখন পৃথিবীর জাতিবর্গের মাঝে নিজেদের কোনো মর্যাদা ও অবস্থান খুঁজে পাই না। সুন্নাতুল্লাহ ও ফরজ বিধানের প্রতি এই অবহেলার কারণে পরকালেও আমরা মুমিনদের মাঝে কোনো মর্যাদা ও অবস্থান খুঁজে পাব না!

এটা ঠিক যে, কেবল রাতজাগাই আমাদের সকল দুর্যোগ-দুর্বিপাকের একমাত্র কারণ নয়। কিন্তু নিঃসন্দেহে এটি পরিস্থিতির নেতিবাচক পরিবর্তন, সামাজিক জীবনব্যবস্থার স্খলন ও বোধ-বিবেকের অধঃপতনের অন্যতম ক্রিয়াশীল কার্যকারণ।

উম্মাহর মহান সংস্কারক রাসুলে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ও সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে যথাসম্ভব শীঘ্র শয্যাগ্রহণের শিক্ষা

দিয়েছেন; যেন রাতের সর্বোচ্চ সঠিক ব্যবহার হয়, সর্বোচ্চ সঠিক ব্যবহার হয়ে দিবসের।

হজরত আবু বারযা রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া অপছন্দ করতেন (যেন এশার নামাজ ছুটে না যায়) এবং এশার পর কথাবার্তা বলা অপছন্দ করতেন।[৮০]

এশার পর সুস্পষ্ট কোনো প্রয়োজনে বা এমন সুনিশ্চিত কোনো কল্যাণের উদ্দেশ্যেই কথা বলা যেতে পারে, যা এই নির্দিষ্ট সময় ছাড়া বাস্তবায়ন হবে না। আর এশার পর এই বিলম্বও হতে পারবে সুনির্দিষ্ট ও সীমিত সময়ের জন্য।

ইসলাম পুরোপুরি সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খলিত একটি ধর্ম। ইসলাম একটি সামগ্রিক জীবনবিধান। আমি-আপনি যদি ইসলামকে পরিপূর্ণ গ্রহণ করি, ইসলাম আমার-আপনার ইহকালীন-পরকালীন কল্যাণ বয়ে আনবে আর যদি আমরা প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী ইসলামকে ব্যবচ্ছেদ করি; কিছু গ্রহণ করি, কিছু বর্জন করি, তাহলে তা আমাদের দুনিয়া-আখিরাতে কোনো কাজে আসবে না।

﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

(হে নবী! তাদেরকে আরও বলুন,) এটা আমার সরল-সঠিক পথ। সুতরাং এর অনুসরণ করো, অন্য কোনো পথের অনুসরণ করো না, অন্যথায় তা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। হে মানুষ! এসব বিষয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে গুরুত্বের সঙ্গে আদেশ করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পার। [সুরা আনআম : ১৫৩]

[দুই]

নিদ্রার বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপদেশ হলো আপনি ঠিক সেভাবে ঘুমাবেন, যেভাবে নবীজি ঘুমিয়েছেন এবং ঘুমের পূর্বে সেসব দোয়া পাঠ করবেন, যেসব দোয়া নবীজি নিয়মিত ঘুমের পূর্বে পাঠ করেছেন।

---

৮০. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং-৫৬৮।

ঘুমের সুন্নাত-পদ্ধতি সকল সুনান ও হাদিস-গ্রন্থে উল্লেখ আছে। এ সংক্রান্ত রেওয়ায়েতের সংখ্যা প্রচুর, যা এখানে পরিপূর্ণ আলোচনা করা সম্ভবপর নয়। তন্মধ্যে সর্বাবস্থায় পালনীয় কিছু সুন্নাত হলো—

- অজুর সাথে ঘুমানো।
- ডান কাত হয়ে ঘুমানো।
- ঘুমের সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ও ফজিলতপূর্ণ দোয়াসমূহ পাঠ করা।

উদাহরণস্বরূপ কিছু আমল ও দোয়ার কথা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. হজরত বারা বিন আযিব রাযি. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

যখন তুমি বিছানায় যাবে, তখন নামাজের অজুর মতো অজু করে নেবে। তারপর ডানপার্শ্বে শুয়ে এই দোয়া পড়বে,

«اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِيْ إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ. اَللّٰهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ»

হে আল্লাহ, আমার জীবন আপনার কাছে সমর্পণ করলাম। আমার সকল কাজ আপনার কাছে সোপর্দ করলাম এবং আপনার প্রতি আকাঙ্ক্ষা ও আশঙ্কা নিয়ে আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করলাম। আপনি ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থল ও নাজাতের স্থান নেই। হে আল্লাহ, আমি ঈমান আনলাম আপনার অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি এবং আপনার প্রেরিত নবীর প্রতি।

নবীজি এরপর বললেন,

তারপর যদি সে রাতেই তোমার মৃত্যু হয়, তাহলে ইসলামের ফিতরাতের ওপর তোমার মৃত্যু হবে। এ কথাগুলি তোমার শেষ কথা বানিয়ে নাও।[৮১]

২. ইমাম বুখারি রহ. হজরত আবু হোরায়রা রাযি.-সূত্রে একটি দীর্ঘ হাদিস উল্লেখ করেছেন, যাতে হজরত আবু হোরায়রা রাযি.-এর সঙ্গে বিতাড়িত

---

৮১. সহিহ বুখারি, হাদিস নং-২৪৭।

শয়তানের একটি কথোপকথনের ঘটনা উল্লেখ আছে। উক্ত বর্ণনায় আছে, হজরত আবু হোরায়রা রাযি. কীভাবে শয়তানকে পাকড়াও করেছিলেন, এরপর শয়তান তাকে শয়তানদের ওপর বিজয়ী হওয়ার অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম বলে দিয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে আবু হোরায়রা রাযি. নবীজিকে বিস্তারিত বিষয় জানালে নবীজি তা সমর্থন করে আবু হোরায়রাকে বলেছিলেন,

«صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ»

সে সত্য কথা বলেছে; যদিও সে চরম মিথ্যাবাদী শয়তান।

শয়তানের বাতলানো সেই পদ্ধতিটি হলো ঘুমানোর পূর্বে আয়াতুল কুরসি পাঠ করা। শয়তান আবু হোরায়রা রাযি.-কে বলেছিল,

«لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ»

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নিযুক্ত একজন হেফাজতের ফিরেশতা সর্বদা আপনার সঙ্গে থাকবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান আপনার কাছে আসতে পারবে না।[৮২]

এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ, শয়তান হলো ফজরের নামাজ আদায়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যকারণ। শয়তান চায়, আপনি যেন পুরো রাত আপনার বিছানাতেই কাটিয়ে দেন এবং তাহাজ্জুদ ও ফজরের নামাজের জন্য জাগ্রত হতে না পারেন। ঘুমানোর পূর্বে আয়াতুল কুরসি পাঠ করা হলে শয়তান কিছুতেই আপনার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না এবং ইনশাআল্লাহ, আপনার পক্ষে জাগ্রত হওয়া সহজ হবে।

৩. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন শয্যাগ্রহণ করতে যায়, তখন সে যেন তার লুঙ্গির ভেতর-অংশ দিয়ে নিজ বিছানাটা ঝেড়ে নেয়। কারণ, সে জানে না যে, বিছানার ওপর তার অজ্ঞাতসারে কষ্টদায়ক কোনো কিছু রয়ে গেছে কি-না। তারপর এই দোয়া পড়বে—

«بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ»

---

৮২. সহিহ বুখারি, হাদিস নং-৫০১০।

হে আমার প্রতিপালক, আপনারই নামে আমার দেহখানা বিছানায় রাখলাম এবং আপনার নামেই আবার ওঠাব। যদি আপনি এর মধ্যেই আমার জান কবজ করে নেন, তাহলে তার ওপর দয়া করবেন। আর যদি তা আমাকে ফিরিয়ে দেন, তবে তাকে এমনভাবে হেফাজত করবেন, যেভাবে আপনি আপনার নেক বান্দাদের হেফাজত করে থাকেন।[৮৩]

[তিন]

ঘুম সংক্রান্ত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ হলো আপনি যথাসম্ভব সকলকে আপনার নতুন নিদ্রাসূচি জানিয়ে দেবেন। পরিচিত সকলের কানে এ বিষয়টি পৌঁছিয়ে দেবেন যে, আপনি ভোরে আগে আগে জাগার জন্য প্রথম রাতে আগে আগে শুয়ে পড়েন। এর ফলে সকলে এ কথা বুঝতে পারবে যে, উদাহরণস্বরূপ রাত নয়টা-দশটার পর আপনাকে ফোন করা হলে, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা বা কথা বলার চেষ্টা করা হলে আপনি তা পছন্দ করবেন না। এই নতুন নিয়ম জানিয়ে দেওয়ায় আপনার জন্য লজ্জার কিছু নেই! লজ্জা তো বরং তাদের হওয়া উচিত, যাদেরকে আপনি বিষয়টি জানিয়ে দিচ্ছেন; যারা মানবিক প্রকৃতিসম্মত রীতি পরিত্যাগ করেছে এবং পৃথিবীর সুষম ভারসাম্যকে বদলে দিয়েছে!

অধিকন্তু একই সঙ্গে এটি দাওয়াত ইলাল্লাহ-এর একটি মাধ্যমও বটে। আপনি যখন আপনার প্রিয়জন ও পরিচিতজনদের জানিয়ে দেবেন যে, আপনি ভোরে আগে আগে জাগার জন্য প্রথম রাতে আগে আগে শুয়ে পড়েন এবং এর মাধ্যমে আপনি একদিকে আপন জীবনে নবীজির সুন্নাত বাস্তবায়ন করছেন, অপরদিকে আপনি এ কাজ করছেন ফজরের ফরজ নামাজ নিয়মিত যথাসময়ে আদায় করার জন্য, তখন এ সবকিছু অন্যদেরকেও আপনার অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করবে। আর এর আজর ও সাওয়াব আপনার আমলনামাকেও সমৃদ্ধ করবে, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা—তিনি যেন আমাদের জন্য যা কল্যাণকর, তা-ই আমাদের শিক্ষা দেন; আর যা আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফিক দেন।

---

৮৩. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং-৬৩২২ ও *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং-২৭১৪।

সপ্তম মাধ্যম

সান্ধ্যভোজনে হন মিতাহারী!

এটি শরিয়তের দিক থেকে যেমন ফজরের নামাজের জন্য জাগ্রত হতে অত্যন্ত কার্যকরী মাধ্যম, স্বাস্থ্যগত দিক থেকেও অত্যন্ত উপকারী একটি অভ্যাস। রাতের খাবার কম গ্রহণের উপকারিতা নিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও চিকিৎসকদের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। রাতে স্বল্পাহার বিশেষভাবে ফজরের নামাজ আদায়ে এবং সাধারণভাবে সবদিক থেকে উপকারী।

বরং প্রকৃত স্বাস্থ্যনীতি তো হলো—মানুষ কেবল রাতেই নয়, দিনের কোনো অংশেই মাত্রাতিরিক্ত খাবার গ্রহণ করবে না।

হজরত মিকদাম বিন মাদিকারিব রাযি. বর্ণনা করেন, আমি নবীজিকে বলতে শুনেছি—

«مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ. بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ»

পেটের চেয়ে মন্দ কোনো পাত্র মানুষ ভরাট করে না! পিঠের দাঁড়া সোজা রাখার মতো কয়েক লোকমা খানাই আদম সন্তানের জন্য যথেষ্ট। আরও বেশি ছাড়া যদি তা সম্ভব না হয়, তবে পেটের এক-তৃতীয়াংশ খানার জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং বাকি এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।[৮৪]

এটি অতি চমৎকার ও সুষম একটি স্বাস্থ্যনীতি!

যদিও এ নিয়ম দিনের বেলায়ও প্রযোজ্য ও পালনীয়; কিন্তু রাতের বেলায় এটি পালন করা আমাদের জন্য আরও বেশি প্রয়োজনীয়। কারণ, ঘুমানোর পূর্বে অধিক ও ভারী খাবার গ্রহণ করলে শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রচুর ক্ষতি হয়, ঘুমে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাঘাত ঘটে। তা ছাড়া এর ফলে শরীর মুটিয়ে যায়,

---

৮৪. *জামে তিরমিজি*, হাদিস নং-২৩৮০।

স্বাভাবিক নড়াচড়ার সামর্থ্য কমে যায়, অলসতা ও অবসন্নতা বেড়ে যায় এবং ফজরের নামাজের নির্ধারিত সময়ে জাগ্রত হওয়ার সক্ষমতা কমে যায়।
এ কারণেই জনৈক অন্তর্জ্ঞানী বলেছেন,

تَأْكُلُ كَثِيْرًا، تَنَامُ كَثِيْرًا؛ يَفُوْتُكَ خَيْرٌ كَثِيْرٌ!

বেশি খাবে তো বেশি ঘুমাবে আর অনেক কল্যাণ-সম্পদ হেলায় হারাবে!

স্বাভাবিকভাবেই তিনি এর দ্বারা তাহাজ্জুদের নামাজ ছুটে যাওয়ার কথা বুঝিয়েছেন। তাহলে ফজরের ফরজ নামাজ ছুটে যাওয়া কেমন ক্ষতির কারণ?!

আহার সংক্রান্ত আলোচনার সূত্রে আরেকটি কথা আপনাকে বলছি। রাতের বেলা চা-কফি পান করার কোনো প্রয়োজন বা উপকার নেই। একই কথা প্রযোজ্য কোমল পানীয়ের ক্ষেত্রেও। কারণ, এ সবগুলোতেই ক্যাফেইন থাকে, যা মস্তিষ্ককে উত্তেজিত করে তোলে। ফলে দীর্ঘ রাত পর্যন্ত বিনিদ্র কেটে যায় অথবা ঘুমে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া এগুলোতে থাকে মূত্রবর্ধক উপাদান। ফলে রাতে বারবার শয্যাত্যাগের প্রয়োজন হয়। কখনো এর ফলে এ পরিমাণ বিরক্তি ও কষ্ট হয় যে, ফজরের নির্ধারিত সময়ে বিছানা ত্যাগ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

অষ্টম মাধ্যম

ফজরের ফাজায়েল সম্বলিত স্মারক!

এটিও অভিনব ও চমৎকার একটি পদ্ধতি। অধিকাংশ মুসলমান এমনকি যারা দীর্ঘ দিন যাবৎ ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করেন, তাদের জন্যও এ পদ্ধতিটি উপকারী বিবেচিত হবে।

ফাজায়েল সম্বলিত স্মারক দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ভারী কাগজের বোর্ড বা কার্টন দিয়ে অনেকগুলো ফেস্টুন তৈরি করা, যাতে আপনি ফজরের নামাজের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী আজর ও সাওয়াবের বিবরণ সম্বলিত নবীজির বিভিন্ন হাদিস লিখে নেবেন। এরপর সেই ফেস্টুনগুলো আপনার বাড়িতে আপনার কামরার দেয়ালে সেঁটে দেবেন। যতবার কাগজগুলোর প্রতি আপনার দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে, প্রতিবারই আপনার এই ফজিলতগুলো স্মরণ হবে, আপনার উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাবে, আগ্রহ-স্পৃহা বাড়বে এবং ফজরের নামাজের জন্য জাগ্রত হতে আপনার সংকল্প দৃঢ় ও শক্তিশালী হবে।

এ সম্পর্কে আপনাকে উপকারী কিছু নসিহত করছি।

- হাদিসগুলো চিত্তাকর্ষক বিভিন্ন রঙের কাগজে তৈলাক্ত কালি দিয়ে লিখবেন, যেন সেগুলো আপনার মনোযোগ কেড়ে নেয়।
- বোর্ডগুলোর আয়তন যেন তুলনামূলক বড় হয় এবং আপনি যেন সহজেই লেখাগুলো পড়তে পারেন। আমার মনে হয় দৈর্ঘ্যে ২০ সেন্টিমিটার ও প্রস্থে ১৫ সেন্টিমিটার এক্ষেত্রে যথার্থ আয়তন।
- হাদিসগুলো সুস্পষ্ট ও সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখবেন। আপনি নিজে যদি সুন্দর করে লিখতে না পারেন, তাহলে আপনার কোনো বন্ধুকে দিয়ে লিখিয়ে নেবেন। এর ফলে একই সঙ্গে আপনার বন্ধুও ফজরের নামাজের প্রতি যত্নবান হওয়ার দাওয়াত পেয়ে যাবেন!
- ফেস্টুনগুলো আপনার কামরার দৃশ্যমান কোনো জায়গায় সেঁটে দেবেন।

- সবগুলো বোর্ড একবারে লাগাবেন না। বরং প্রতি সপ্তাহে দুটি বা তিনটি বোর্ড লাগাবেন। দ্বিতীয় সপ্তাহে সেগুলোর পরিবর্তে অন্য তিনটি বোর্ড লাগাবেন। এর ফলে আপনি একই লেখা সব সময় দেখার কারণে নিরাসক্তির শিকার হবেন না এবং কার্ডগুলোর প্রভাবশক্তিও কমবে না। আপনি যদি বিশটি বা ত্রিশটি ফেস্টুন তৈরি করে নেন, তাহলে একেকটি ফেস্টুন আপনি প্রতি দশ সপ্তাহ পরপর দেখবেন। এর ফলে যখনই আপনি একটি হাদিস পড়বেন, আপনার কাছে মনে হবে যে, হাদিসটি আপনি প্রথমবার পড়ছেন। নিঃসন্দেহে এটি অধিক উপকারী প্রমাণিত হবে।

উদ্দীপক এই ফাজায়েল স্মারকগুলো আপনার জীবনে সমূহ কল্যাণ ও উপকার বয়ে আনবে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো—

- এই কার্ডগুলো আপনার হৃদয়ে ফজরের নামাজের আজর ও সাওয়াবের বিশ্বাস স্থায়ীভাবে বদ্ধমূল করে দেবে। আপনি জাগ্রত হওয়ার যথেষ্ট প্রস্তুতি নিতে ক্লান্তি ও দুর্বলতা বোধ করবেন না।

- আপনি যদি নিয়মিত ফজরের নামাজ আদায়কারীও হয়ে থাকেন, তারপরও হয়তো মাঝে-মধ্যে ফজরের নামাজের স্বতন্ত্র সাওয়াব ও অত্যুচ্চ মর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে থাকেন। ফলে আপনার ফজরের নামাজ রুহ ও রুহানিয়াত, প্রাণ ও প্রাণশক্তি এবং অদম্য স্পৃহা-শূন্য অভ্যাসগত একটি আচারে পরিণত হয়। কিন্তু আপনি যদি প্রতিদিন ফজরের নামাজের ফজিলত ও অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি করে হাদিস নিয়মিত পাঠ করেন, সর্বদাই এই বিশেষ আমলের অনির্বচনীয় এক স্বাদ অনুভব করতে থাকবেন।

- বারবার দেখতে দেখতে এক সময় আপনার হাদিসগুলো মুখস্থ হয়ে যাবে। আর হাদিস মুখস্থ করার উপকার ও কল্যাণ তো কারোরই অজানা নয়। হাদিস মুখস্থ থাকলে তো আপনি আপনার বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতজনদেরকেও এই ব্যাপক ফজিলতের কথা সহজে স্মরণ করিয়ে দিতে পারবেন।

- আপনার সঙ্গে একই বাড়িতে বসবাসকারী পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণও প্রতিদিন স্মারকগুলো দেখতে পাবে। যদি তারা ফজরের নামাজ আদায়ে যত্নবান না হয়ে থাকে, তাহলে এই হাদিসগুলো তাদেরকে ফজরের ফজিলত স্মরণ করিয়ে দেবে। হয়তো এর উসিলায় তারাও নিয়মিত ফজরের নামাজ আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। বিনিময়ে আপনি লাভ করবেন তাদের আমলের সমপরিমাণ সাওয়াব, তাদের সাওয়াবে কোনো ধরনের হ্রাস না ঘটিয়েই!

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে কথা ও কাজে এবং আচরণে ও উচ্চারণে সততা ও নিষ্ঠা দান করেন।

নবম মাধ্যম
তিনটি সংকেতধ্বনি!

[সংকেতধ্বনি এক : ঘড়ির অ্যালার্ম]

এটি ভোরে জাগ্রত হওয়ার অন্যতম মৌলিক মাধ্যম। মনে রাখবেন, আপনি যদি আপনার ঘড়িতে ফজরের নামাজের পরের কোনো সময়ে অ্যালার্ম নির্ধারণ করে রাখেন, তাহলে এটি সুস্পষ্ট বাহ্যিক প্রমাণ যে, আপনি ফজরের ফরজ ইচ্ছাকৃতভাবেই পরিত্যাগে আগ্রহী। এটি অত্যন্ত ভয়াবহ আলামত। আল্লাহর কাছে আপনার ও আমাদের সকলের জন্য সুস্থতা ও আফিয়াত কামনা করি।

ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখার বিষয়ে আমার বিশেষ কিছু পরামর্শ রয়েছে—

ফজরের একেবারে সঠিক ও নির্ধারিত সময়েই অ্যালার্ম নির্ধারণ করবেন, যেন আজানের সময় হলেই অ্যালার্ম বেজে ওঠে। তাহলে আপনার ঘুম ভাঙতেই আপনার কানে প্রতিধ্বনিত হবে আজানের সুমধুর কালিমাগুলো—হাইয়া আলাস সালাহ! হাইয়া আলাল ফালাহ! আসাসালাতু খাইরুম মিনান নাওম! আল্লাহু আকবার! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! এই কালিমাগুলো ইনশাআল্লাহ আপনার হৃদয় ও আত্মা, দেহ ও মনকে নামাজের জন্য জেগে উঠতে আন্দোলিত করবে।

গোড়াতেই নিজের প্রতি অতি-সুধারণার প্রয়োজন নেই। শুরুতেই আপনি ফজরের নামাজেরও পূর্বে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ার সংকল্প করতে যাবেন না। আপনার যদি আগে থেকে নামাজের জন্য জাগ্রত হওয়ার অভ্যাস না থাকে আর আপনি অ্যালার্ম দিয়ে রাখেন ফজরের ওয়াক্তেরও পূর্বে; হোক তা পনেরো মিনিট, বেশিরভাগ সময় দেখা যাবে—অ্যালার্ম বেজে উঠতেই আপনি ঘুম-ঘুম চোখে অ্যালার্ম বন্ধ করে আবার আরাম করছেন! শয়তান আপনাকে কুমন্ত্রণা দেবে, এই আর মাত্র পাঁচ মিনিট! কিন্তু পাঁচ মিনিট আর শেষ হবে না!

আমার প্রিয় দ্বীনি ভাই-বোন, সাবধান! এই পাঁচ মিনিট আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচ মিনিট! এই পাঁচ মিনিটের বিশ্রামই আপনার জীবনে আল্লাহ-নির্ধারিত অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ ছুটে যাওয়া নিশ্চিত করবে!

সুতরাং আপনার প্রতি আমার উপদেশ হলো প্রথমেই অতি-সুধারণার পরিবর্তে ক্রমোন্নতির পন্থা অবলম্বন করুন। প্রথমে নিয়মিত ফজরের নামাজ জামাতে আদায়ের চেষ্টা করুন। যখন আপনি ফজরের নির্ধারিত সময়ে নিয়মিত জাগ্রত হওয়ার বিষয়ে নিজের সামর্থ্যের প্রতি পরিপূর্ণ আশ্বস্ত হবেন এবং ফজরের নামাজের স্বাদ ও মিষ্টতা অনুভব করবেন, তখন আপনি চাইলে তাহাজ্জুদ আদায়ের উদ্দেশ্যে অ্যালার্মের সময়টি কয়েক মিনিট এগিয়ে দিন। এরপর ধীরে ধীরে আপনার সামর্থ্য ও শক্তির চাহিদা অনুসারে অ্যালার্ম আরও এগিয়ে দিতে পারেন।

হজরত আনাস রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«إِنَّ هٰذَا الدِّيْنَ مَتِيْنٌ، فَأَوْغِلُوْا فِيْهِ بِرِفْقٍ»

> নিঃসন্দেহে এই ধর্ম হলো সুদৃঢ় ও সুসংহত। সুতরাং তোমরা তাতে কোমলতার সাথে প্রবিষ্ট হও।[৮৫]

আপনি এমন অ্যালার্ম ঘড়ি কিনবেন, যার আওয়াজ বাদ্যযুক্ত নয়; বরং তুলনামূলক বিরক্তিকর ও অস্বস্তিকর। এর ফলে আপনার জন্য জেগে ওঠা অধিক সহজ হবে।

আপনি চাইলে একাধিক অ্যালার্ম ঘড়ি কিনতে পারেন এবং প্রতিটি ঘড়িতে উদাহরণস্বরূপ পাঁচ মিনিটের পার্থক্য করে অ্যালার্ম দিয়ে রাখতে পারেন। এর ফলে ফজরের জন্য আপনার জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা আরও বৃদ্ধি পাবে। আপনি যদি অনিচ্ছায় ঘুমের ঘোরে একটি অ্যালার্ম বন্ধও করে দেন, অন্যগুলো আপনাকে জাগিয়ে তুলবে।

---

৮৫. ইমাম আহমাদ, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং-১৩০৫২।

আপনি যদি আপনার ঘড়ির অ্যালার্মের আওয়াজে অভ্যস্ত হয়ে যান, তাহলে আপনার বন্ধুর সঙ্গে ঘড়িটি বদলেও নিতে পারেন। এর ফলে আপনি এবার নতুন আওয়াজ শুনতে পাবেন এবং আপনার জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।

অ্যালার্ম ঘড়ি আপনার হাতের নাগালে রাখবেন না; বরং আপনার রুমের তুলনামূলক দূরবর্তী কোনো স্থানে রাখবেন, যাতে নির্ধারিত সময়ে অ্যালার্ম বেজে উঠলে আওয়াজ বন্ধ করার জন্য আপনাকে বিছানা ছাড়তে হয়। একবার বিছানাত্যাগ আপনার জাগ্রত হওয়ার ক্ষেত্রে অধিক সহায়ক হবে।

[সংকেতধ্বনি দুই : টেলিফোন/মুঠোফোন]

আপনি আপনার এক বা একাধিক বন্ধুর সঙ্গে একমত হতে পারেন যে, আপনাদের মধ্যে যে-ই প্রথম ঘুম থেকে জেগে উঠবে, সে ফোন করে অন্যদের জাগিয়ে দেবে। এভাবে আপনারা একে অপরকে নেক আমলে সহায়তা করতে পারেন।

এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি উপদেশ হলো—আপনি আপনার বন্ধুকে বলবেন, সে যেন আপনার সঙ্গে ফোনে একটু দীর্ঘ সময় কথা বলে, যেন ফোনে কথা শেষ হতেই আপনি সাথে সাথে আবার ঘুমিয়ে না পড়েন। এ বিষয়টিও অত্যন্ত কার্যকরী যে, আপনি নিজে জাগ্রত হওয়ার পর অন্যকে জাগানোকেও আপনার দায়িত্ব বানিয়ে নেবেন। অন্যের প্রতি আপনার এই দায়িত্ব-অনুভূতি আপনাকে নিয়মিত জেগে উঠতে সংকল্পবদ্ধ করে তুলবে, ইনশাআল্লাহ।

[তৃতীয় সংকেতধ্বনি : দরজার কলিংবেল]

আপনার কোনো প্রতিবেশীর সঙ্গে আপনি একমত হতে পারেন যে, তিনি ভোরে জাগ্রত হলে আপনার বাড়ির পাশ দিয়ে যাবেন এবং আপনাকে জাগাতে আপনার কলিংবেলে চাপ দেবেন। এটি অত্যন্ত কার্যকর পদ্ধতি। কারণ, কলিংবেলের আওয়াজ শুনে আপনি নিশ্চয়ই ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলবেন। এরপর আবার আপনি ঘুমিয়ে পড়বেন, এমনটি ভাবা বেশ কঠিন।

অবশ্য আপনার পরিবারের সদস্যদেরকেও জানিয়ে রাখতে ভুলবেন না যে, প্রতিদিন ফজরের সময় একজন প্রতিবেশী এসে কলিংবেল চাপবেন। অন্যথায় শেষ রাতে বাড়িতে কোনো ভীতিকর পরিস্থিতিও সৃষ্টি হতে পারে!

যাবতীয় নেক আমলের জন্য আল্লাহর কাছেই আমার-আপনার-সকলের জন্য তাওফিক প্রার্থনা করছি।

অন্যকেও দাওয়াত প্রদান!

প্রিয় পাঠক, নিজে ফজরের নামাজ আদায়ে সচেষ্ট হওয়ার পাশাপাশি অন্যকেও ফজরের নামাজের জন্য ডাকুন, আহ্বান করুন।

এটি নিজে জাগ্রত হওয়ার অতি চমৎকার একটি মাধ্যম। কারণ, যে ব্যক্তি অন্যকে কোনো কল্যাণের প্রতি আহ্বান করে, সে নিজে কি করে তা থেকে উদাসীন থাকবে?!

আল্লাহ যখন দেখবেন, আপনি তার বান্দাদেরকে তার ফরজ বিধানের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, তাদেরকে ফজরের নামাজ আদায়ে উদ্বুদ্ধ করছেন, তারপর তিনি আপনাকে তা আদায়ে সহায়তা করবেন না, এমনটা হতেই পারে না! আল্লাহ তাআলা তো পরম দয়াময় সত্তা! বিশ্বাস রাখুন, আল্লাহর রাস্তায় আপনার সার্বক্ষণিক কর্মপ্রচেষ্টা আপনাকে আল্লাহর সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্কের নিশ্চয়তা দেবে।

আপনি এ দায়িত্ব শুরু করবেন আপনার পরিবার-পরিজন দিয়ে; আপনার স্ত্রী-সন্তান, মাতা-পিতা ও ভাই-বোনদের দিয়ে। আপনি নিজেই যখন ফজরের নামাজ আদায়ে কাঠিন্য অনুভব করেন, তাহলে আপনার প্রিয়জনরাও যে একই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু আপনি আপনার সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে তাদের জানাতে পারেন, উদ্বুদ্ধ করতে পারেন এবং সহায়তা করতে পারেন।

জেনে রাখুন, পরিবারের প্রতি আপনার এই দায়িত্ব পালন তাদের প্রতি আপনার অনুকম্পা প্রদর্শন নয়; বরং আপনার অপরিহার্য দায়িত্ব এবং আপনার প্রতি তাদের অধিকার।

বিশিষ্ট সাহাবি হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি. বর্ণনা করেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—

«كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِه، اَلْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِه، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِيْ أَهْلِه وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِه، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِيْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِيْ مَالِ سَيِّدِه وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». قَالَ : وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ : «وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِيْ مَالِ أَبِيْهِ وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِه، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».

‘তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল, প্রত্যেকে আপন অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নেতা দায়িত্বশীল, সে আপন অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। প্রতিটি পুরুষ আপন পরিবারের দায়িত্বশীল, সে আপন অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর বাড়িতে দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। সেবক আপন মনিবের সম্পদের দায়িত্বশীল, তাকে আপন দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।’

রাবি (আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি.) বলেন, আমার মনে হয় নবীজি এ কথাও বলেছেন যে, ‘পুত্র আপন পিতার সম্পদের দায়িত্বশীল, তাকে আপন দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল, প্রত্যেককে আপন আপন দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।’[৮৬]

পরিবার-পরিজনের পাশাপাশি আপনার বন্ধু-বান্ধব, প্রিয়জন ও পরিচিতজনকেও এই মহা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করুন।

প্রতিদিন তাদেরকে ফজরের নামাজের কথা বলুন; বলুন ফজরের নামাজের গুরুত্বের কথা।

সম্ভব হলে তাদের সঙ্গে মসজিদে ফজরের নামাজে সাক্ষাতের নির্ধারিত সময় ঠিক করে নিন।

---

৮৬. ইমাম বুখারি, *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং-৮৯৩।

ফজরের নামাজ সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদিস লিখে তাদেরকে হাদিয়া দিন, তারাও পাঠ করুক এই ফজিলতের কথা।

ফজিলতের হাদিসগুলো লিখে পাঠাতে পারেন ইন্টারনেটের মাধ্যমে তাদের ই-মেইলের ইনবক্সে (এবং মুঠোফোন-বার্তায়)। ফজরের নামাজের পূর্বে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন ফোনে।

আপনার অফিস-রুমে, কর্মক্ষেত্রে এবং এলাকার দৃশ্যমান বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করতে পারেন ফজরের নামাজের ফজিলত-সম্বলিত বিভিন্ন পোস্টার-প্লাকার্ড।

আপনার বন্ধুদের জন্য উপযোগী কিছু উদ্ভাবন করুন, তাদেরকে কখনো ভুলে যাবেন না।

মনে রাখবেন, আপনার আহ্বানে এবং আপনার প্রচেষ্টায় যারা ফজরের নামাজ আদায় করবে, আপনি তাদের অনুরূপ সাওয়াব লাভ করবেন; লাভ করবেন তাদের পরবর্তী প্রজন্মের সমান সাওয়াবও, যাদেরকে তারা ভবিষ্যতে ফজরের নামাজের দাওয়াত দেবে। সাওয়াবপ্রাপ্তির এই ধারা চলবে কিয়ামত পর্যন্ত, কিয়ামত পর্যন্ত সমৃদ্ধ হতে থাকবে আপনার আমলনামা! এ এক বিরাট ফজিলত! কল্পনাতীত কল্যাণধারা!

হজরত জারির বিন আবদুল্লাহ রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَه، كُتِبَ لَه مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَه، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ»

যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো ভালো রীতির প্রচলন করবে এবং পরবর্তীকালে সে রীতি অনুযায়ী আমল করা হবে, তাহলে আমলকারীর সাওয়াবের সমপরিমাণ সাওয়াব তার (অর্থাৎ প্রচলনকারীর) জন্য লিপিবদ্ধ করা হবে। এতে তাদের (অর্থাৎ আমলকারীদের) সাওয়াবে কোনোরূপ ঘাটতি হবে না। আর যে

ব্যক্তি ইসলামে কোনো কু-রীতির (মন্দকাজের) প্রচলন করবে এবং তার পরে সে অনুযায়ী আমল করা হবে, তাহলে ওই আমলকারীর মন্দ কর্মের সমপরিমাণ গুনাহ তার জন্য লিপিবদ্ধ করা হবে। এতে তাদের গুনাহ মোটেও হ্রাস করা হবে না।[৮৭]

দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা আমাকে-আপনাকে এবং পুরো মুসলিম উম্মাহকে পরিপূর্ণ হেদায়েত দান করুন।

* * *

একনজরে

ফজরের নামাজ যথাসময়ে আদায়ে সহায়ক দশটি উপায় ও মাধ্যম

১. আল্লাহ তাআলার জন্য একনিষ্ঠ হন; আল্লাহ পাকের যথাযোগ্য মর্যাদা হৃদয়ে ধারণ করুন।

২. ফজরের নামাজ আদায়ের দৃঢ় সংকল্প করুন; প্রতিদিন নিজের আমলের মুহাসাবা করুন।

৩. আপন গুনাহ হতে তাওবা করুন;, গুনাহমুক্ত জীবন গড়ার মজবুত প্রতিজ্ঞা করুন।

৪. আল্লাহ যেন আপনাকে ফজরের নামাজের অমূল্য সম্পদ নসিব করেন, এজন্য প্রচুর দোয়া করুন।

৫. সৎ-সঙ্গ ও সৎ লোকদের সাহচর্য অবলম্বন করুন।

৬. সুন্নাত পদ্ধতিতে ঘুমানোর চর্চা করুন। (আগে আগে শুয়ে পড়ুন, অজুর সঙ্গে ঘুমান, ডান কাতে শয্যাগ্রহণ করুন, নিদ্রাসংক্রান্ত দোয়াসমূহ পাঠ করুন এবং অন্যদেরকে নিজের নতুন নিদ্রানীতি অবহিত করুন।)

৭. নিদ্রার পূর্বে অধিক আহার করবেন না। রাতে চা-কফি ইত্যাদি উত্তেজক পানীয় পরিহার করুন।

৮. ফজরের নামাজের ফজিলত সম্বলিত বিভিন্ন হাদিস ও বাণী কার্ডে লিখে আপনার কামরায় সেঁটে দিন।

৯. অ্যালার্ম ঘড়ি, টেলিফোন ও কলিং বেল—এই তিন সতর্কধ্বনির সহায়তা গ্রহণ করুন।

১০. অন্যকেও ফজরের নামাজ আদায়ে উদ্বুদ্ধ করুন, শুরু করুন নিজের পরিবার হতে।

* * *

শেষ কথা

জাতিগঠনে ফজরের নামাজের ভূমিকা!

পুরুষদের জন্য ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করা এবং নারীদের জন্য প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা মুসলিম উম্মাহর সদস্যদের ব্যক্তি-কল্যাণে তো সহায়ক বটেই; এটি উম্মাহর গঠন ও বিনির্মাণেও একটি কেন্দ্রীয় বিষয়।

প্রিয় পাঠক, আপনি ভাবতে পারেন, কেবল দু রাকাত নামাজের বিষয়-ই তো! আমলনামায় সাওয়াব বৃদ্ধির বিষয়-ই তো! এ ছাড়া আর কী!

না, বিষয়টি আরও বড় কিছু! মুসলিম জাতিসত্তার গঠন ও বিনির্মাণেও ফজরের নামাজের আছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

যথাসময়ে ফজরের নামাজ আদায় মুসলিম জাতির সারা দিনের কর্মবিন্যাসকে আল্লাহ-মনোনীত পদ্ধতির দিকে নিয়ে যাবে, নিয়ে যাবে মানবিক প্রকৃতির স্বাভাবিক জীবনধারার দিকে। ফজরের নামাজই ঠিক করে দেবে, মুসলমানের সারা দিন কেমন যাবে!

ফজরের নামাজ দিনের প্রথম অংশ হতেই উম্মাহকে আপন রবের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে দেবে। মুসলিম উম্মাহ তার দিন শুরু করবে নেক আমল, জিকির, নামাজ ও দোয়ার মাধ্যমে।

ফজরের নামাজ পুরো জাতিকে আল্লাহ তাআলার নিরাপত্তা ও আশ্রয়ে, দায়িত্ব ও তত্ত্বাবধানে স্থান করে দেবে।

প্রিয় পাঠক, ফজরের নামাজেই আপনি সমাজের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ লাভ করবেন।

আপনি মনে করছেন, সমাজের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হলো সম্মান ও মর্যাদা, ক্ষমতা ও সম্পদ, খ্যাতি ও প্রতিপত্তির অধিকারীরা?!

আপনি ভাবছেন, সমাজের শ্রেষ্ঠতম শ্রেণি হলো ক্রীড়াবিদ, শিল্পী, অভিনেতা ও বিনোদন-তারকারা?!

আপনার ধারণা, সমাজের শ্রেষ্ঠতম অংশ হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরগণ, হোক তারা ধর্মনিরপেক্ষ? কিংবা বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবীগণ, হোক তারা ভ্রষ্ট? কিংবা অর্থনীতিবিদ ও শিল্পপতিগণ, হোক তারা অন্ধকার পথের পথিক?!

কক্ষনো নয়! কিছুতেই তারা সমাজের শ্রেষ্ঠতম অংশ নয়!

আপনি যদি সমাজের প্রকৃত শ্রেষ্ঠতম মানুষদের খুঁজে পেতে চান, তাহলে যারা নিয়মিত ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করে, তাদের মাঝেই খুঁজে নিন!

খুঁজে নিন তাদের মাঝে, যারা রাব্বুল আলামিনের পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছে।

অন্যায় ও পাপাচারে ভরা ঘুণে-ধরা এই সমাজে ফজরের নামাজেই আপনি পাবেন প্রকৃত সৎ ও পুণ্যবান লোকদের সাক্ষাৎ।

শঠতা ও কপটতায় পরিপূর্ণ এই সমাজে ফজরের নামাজেই আপনি পাবেন নিষ্ঠাবান-খোদাভীরু বান্দাদের দেখা।

যে সমাজে আজ শুধু অন্যায়-অপরাধ, গুনাহ-অবাধ্যতা ও অনাচার-অবিচার, সেই দুষ্ট সমাজে আপনি তাদের সাক্ষাৎ পাবেন, যাদের হৃদয় আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভে প্রবল আগ্রহী, কল্যাণ অর্জনে প্রচণ্ড উৎসাহী; যারা পরিত্যাগ করেছে কোমল শয্যার উষ্ণতা, দেহের প্রশান্তি ও জাগতিক ইচ্ছা-অভিপ্রায়; মানুষের প্রতিশ্রুতি ত্যাগ করে যারা আল্লাহ-অভিমুখী হয়েছে আল্লাহ-নির্ধারিত সময়ে আল্লাহর ঘরে আল্লাহর সাক্ষাৎলাভের আশায়!

আল্লাহ পাকের কী দয়া ও অনুগ্রহ! আল্লাহ তাআলার কী অপার রহমত ও করুণা!

প্রিয় পাঠক, ফজরের নামাজ তো হলো জাতির মান ও স্তর নির্ণয়ের মাপকাঠি, জাতির মর্যাদা ও মূল্যবোধ নির্ণয়ের মানদণ্ড।

যে জাতি জামাতে ফজরের নামাজ আদায়ে শিথিলতা করে, সে জাতি দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত জাতি নয়; বরং অপসারণযোগ্য জাতি!

যে জাতি ফজরের নামাজ জামাতে আদায়ে উদ্যমী, তাদের পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত ও কর্তৃত্ববান হওয়ার সময় নিকটবর্তী!

একজন দাঈ ও দ্বীন-প্রচারক নিজে ফজরের নামাজ জামাতে আদায়ে যত্নবান নন, তিনি যতই মানুষের সামনে মুসলিম জাতির পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত ও

ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার পথ ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন, কীভাবে তা বাস্তবায়ন সম্ভব?!

আল্লাহ তাআলা তো বিশৃঙ্খলা ও ফাসাদ-প্রিয়দের কর্মপন্থাকে সংশোধন করেন না। আর আল্লাহ-নির্ধারিত একটি ফরজকে বিনষ্ট করা, আল্লাহর একটি হককে উপেক্ষা করা এবং এই অন্যায়ে অটল থাকার চেয়ে বড় ফাসাদ আর কী হতে পারে?!

যারা পৃথিবীতে ক্ষমতার অধিকারী হবে, তাদের প্রথম গুণ ও বৈশিষ্ট্য কী?!

নিম্নের আয়াতগুলো পাঠ করুন ও ভাবুন—

﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝ اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ﴾

আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করবেন, যারা তার (দ্বীনের) সাহায্য করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী। তারা এমন যে, আমি যদি দুনিয়ায় তাদেরকে ক্ষমতা দান করি, তবে তারা নামাজ কায়েম করবে, জাকাত আদায় করবে, মানুষকে সৎ কাজের আদেশ করবে ও অন্যায়-কাজে বাধা দেবে। সব কাজেই পরিণতি আল্লাহরই হাতে। [সুরা হাজ্জ : ৪০-৪১]

আল্লাহর জমিনে ক্ষমতাপ্রাপ্তদের প্রথম গুণই হচ্ছে নামাজ কায়েম করা!

নামাজ কায়েম করার অর্থ কাকের ন্যায় ঠোকর দেওয়া, অসময়ে মসজিদে হাজিরা দেওয়া নয়!

নামাজ কায়েমের অর্থ হলো নামাজের যাবতীয় শর্ত ঠিক রেখে যথাসময়ে যেখানে আল্লাহ নামাজ কায়েমের নির্দেশ দিয়েছেন সেখানে উপস্থিত হয়ে খুশু-খুজু, বিনয়-একাগ্রতা ও অনুনয়-বিনয়সহকারে নামাজ আদায় করা।

নামাজ যদি হয় উল্লিখিত ধরন ও পদ্ধতিতে, তাহলে তা হবে আল্লাহ ও তার বান্দার মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যম।

এই পদ্ধতির নামাজ হবে নুসরত ও আসমানি সাহায্যলাভের এবং বিজয় ও ক্ষমতালাভের অন্যতম উপাদান।

জনৈক ইহুদি নেতার সেই ঐতিহাসিক উক্তিটি তো সকলেরই জানা আছে—

> "আমরা মুসলমানদের পরোয়া করি না। একমাত্র তখনই তাদের ভয় করব, যখন তাদের ফজরের জামাতে উপস্থিতির সংখ্যা জুমার নামাজে উপস্থিতির সংখ্যায় পৌঁছে যাবে।"

কোনো ইহুদি নেতা এ কথাটি বলে থাকুক কিংবা না, কথা একশ ভাগ সত্য। জামাতে ফজরের নামাজ আদায় ব্যতিরেকে মুসলিম উম্মাহ প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন এক জাতি!

যে জাতি সম্মান ও মর্যাদা, নুসরত ও বিজয় প্রত্যাশা করে, তাদের জন্য ফজরের নামাজে শিথিলতা করা মোটেও সমীচীন নয়।

সুরা বনি ইসরাইলে আমার একটি বিস্ময়কর পর্যবেক্ষণ রয়েছে। সুরা বনি ইসরাইলেই ফজরের নামাজে কুরআন তেলাওয়াতের প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে। এ সুরায় বনি ইসরাইলের পতনের নির্ধারিত সময়ের আসন্নতা, মুসলিম উম্মাহকে তাদের স্থলাভিষিক্তকরণ, নবীন মুসলিম জাতিকে পৃথিবীর নেতৃত্বপ্রদান ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে, এ নেতৃত্ব কেবল তাদেরকেই প্রদান করা হবে, যারা ফজরের নামাজ আদায়ে যত্নবান!

বরং আমি এর চেয়েও বিস্ময়কর ও গভীর এক মর্ম এ সুরা হতে আহরণ করেছি! আর তা হলো—উক্ত সুরায় ফজরের আলোচনার পরেই এসেছে সাহায্যপ্রার্থনার প্রসঙ্গ!

তাদাব্বুর ও গভীর ভাবনার সঙ্গে নিম্নের আয়াতগুলো পাঠ করুন—

﴿اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ ؕ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ۝ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰۤى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ۝ وَ قُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ

صِدْقٍ وَّ اجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝ وَ قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ
الْبَاطِلُ ؕ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

(হে নবী!) সূর্য হেলার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামাজ কায়েম করুন এবং ফজরের সময় কুরআন পাঠে যত্নবান থাকুন। স্মরণ রাখুন, ফজরের তেলাওয়াতে ঘটে থাকে সমাবেশ। রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ পড়ুন, যা আপনার জন্য এক অতিরিক্ত ইবাদত। আশা করা যায়, আপনার প্রতিপালক আপনাকে 'মাকামে মাহমুদ'-এ পৌঁছাবেন। এবং দোয়া করুন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে যেখানে প্রবেশ করাবেন, কল্যাণের সাথে প্রবেশ করাবেন এবং যেখান থেকে বের করবেন, কল্যাণের সাথে বের করবেন এবং আমাকে আপনার নিকট থেকে বিশেষভাবে এমন ক্ষমতা দান করুন, যার সাথে আপনার সাহায্য থাকবে। এবং বলুন, সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা এমন জিনিস, যা বিলুপ্ত হওয়ারই।

[সুরা বনি ইসরাইল : ৭৮-৮১]

শাশ্বত কুরআনের বিস্ময়কর কিছু আয়াত!

অলৌকিক বিধান ও চিরন্তন সংবিধান!

বিশেষ করে ফজরের নামাজ (ফজরের সময় কুরআন পাঠে যত্নবান থাকুন) অথবা তাহাজ্জুদের নামাজ (রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ পড়ুন) কায়েম করার পরই কেবল আল্লাহ তাআলার কাছে উল্লিখিত বিশেষ ক্ষমতা প্রার্থনা করা যাবে, হক ও সত্যের আগমন ঘটবে, বাতিল ও মিথ্যার পতন ঘটবে এবং আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে।

এটিই হলো বিজয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ও মাধ্যম!

সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ. কীভাবে জাতির পুনর্গঠন করেছিলেন?!

তিনি সর্বপ্রথম যে বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা হলো মুসলমানদের মসজিদে জামাতে নামাজ আদায়! তিনি জানতেন, যে বাহিনী জামাতে নামাজ আদায় করবে, একমাত্র তারা-ই ক্রুসেডার ও অন্যান্য জাতীয় শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করতে পারবে।

সুলতান সালাহুদ্দিন রহ. নিছক দরবেশ ছিলেন না। তিনি এই চিন্তা লালন করতেন না যে, সৈন্যসমাবেশ ও যুদ্ধপ্রস্তুতি বাদ দিয়ে সারাদিন মসজিদে আবদ্ধ থেকে আল্লাহর জিকির ও নফল ইবাদতে নিমগ্ন থাকবেন। কক্ষনো নয়। তার কর্মপদ্ধতি এমন ছিল না।

তিনি যুদ্ধপ্রস্তুতি, যুদ্ধপ্রশিক্ষণ, অস্ত্র-ব্যবস্থাপনা, যুদ্ধ-পরিকল্পনা প্রণয়ন, সৈন্যসমাবেশ, উপযুক্ত সময় নির্বাচন, মৈত্রিচুক্তিকরণ, জাতিকে ঐক্যবদ্ধকরণ—বিজয়ের জাগতিক সকল উপায়-উপকরণই অবলম্বন করেছিলেন।

জাগতিক যাবতীয় উপায়-উপকরণ অবলম্বন করলেও তিনি বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ যদি তাকে সাহায্য না করেন, এমন হাজারো উপায় অবলম্বন করেও তিনি কিছুই করতে পারবেন না।

তিনি নিজেই যদি আল্লাহ (এর দ্বীন)-কে সাহায্য না করেন, আল্লাহ কীভাবে তাকে সাহায্য করবেন?!

﴿وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ﴾

আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করবেন, যারা তার (দ্বীনের) সাহায্য করবে। [সুরা হাজ্জ : ৪০]

কীভাবে আল্লাহ এমন মুসলমানদের নুসরত ও সাহায্য করবেন, যারা তার একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ নিয়মিত পরিত্যাগ করে?!

কীভাবে মুসলমানরা ফজরের সময় নামাজ আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকে, এরপর পূর্বাহ্নে, দ্বিপ্রহরে বা সন্ধ্যায় আল্লাহর দরবারে হাত উত্তোলন করে নুসরত ও সাহায্য, বিজয় ও ক্ষমতা এবং আল্লাহর জমিনে কর্তৃত্ব লাভের প্রার্থনা করে?!

এই দ্বীনের সহায়তাকারী তো কেবল সে-ই বিবেচিত হবে, যে সর্বদিক থেকে দ্বীনকে বেষ্টন করে নেবে।

যে ব্যক্তি ইসলামের শাশ্বত আকিদাসমূহ আঁকড়ে ধরবে, সুষম ইবাদত-বিধান পালন করবে, আখলাক ও চরিত্রবিধানে নিজেকে সজ্জিত করবে, নত-শিরে আল্লাহর আনুগত্য করবে, সীমালঙ্ঘনে বিরত থাকবে, ইসলামের ছোট-বড়

সকল বিধানের প্রতি পূর্ণ আগ্রহে অগ্রসর হবে, প্রকৃতপক্ষে সে-ই হলো দ্বীনের সহায়তাকারী।

তার সম্পর্কেই মহান আল্লাহ তাআলার ঘোষণা—

﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ﴾

আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করবেন, যারা তার (দ্বীনের) সাহায্য করবে। [সুরা হাজ্জ : ৪০]

এবার আরও একটি অতি বিস্ময়কর পর্যবেক্ষণ লক্ষ করুন।

পৃথিবীতে মহান আল্লাহ তাআলার যাবতীয় পরিবর্তন; অন্যায়ের দুঃশাসন দূরীভূত করে ন্যায়ের সুশাসন প্রতিষ্ঠা বা ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা দূর করে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সুন্নাত হলো ফজরের নামাজের এই বরকতপূর্ণ সময়ে অর্থাৎ প্রত্যুষেই সংঘটিত হয় যাবতীয় পরিবর্তন!

আমার প্রিয় ঈমানদার ভাই-বোন, সাবধান! এই বরকতপূর্ণ সময়ে ঘুমিয়ে থাকবেন?! পরিবর্তনের এই ঐতিহাসিক সময়ে নিদ্রায় ডুবে থেকে হেলায় হারাবেন অমূল্য কিছু?!

দেখুন, হজরত লুত আ.-এর পাপিষ্ঠ কওমকে কখন ধ্বংস করা হয়েছিল?!

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ؕ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ﴾

নিশ্চিত জেনো, তাদের (ওপর শাস্তি নাজিলের) জন্য প্রভাতকাল স্থিরীকৃত। প্রভাতকাল কি খুব কাছে নয়? [সুরা হুদ : ৮১]

আল্লাহ তাআলা কি তাদেরকে দিন-রাতের অন্য কোনো সময়ে ধ্বংস করতে পারতেন না? তাহলে কেন এই বিশেষ সময়টিকেই নির্বাচন?!

নিঃসন্দেহে প্রত্যুষের বরকতপূর্ণ সময়ই হলো পরিবর্তনের সময়!

প্রত্যুষকাল হলো অন্ধকার দূরীভূত করে আলোর উদ্ভাসের প্রথম ক্ষণ!

ভোরেই হয় অন্যায়ের পর ন্যায় ও ইনসাফের প্রথম পদার্পণ।

ফজরের সময়কালেই হয় অশান্তি বিস্তারের পর সংস্কারের প্রথম পদক্ষেপ।

কীভাবে বিনাশ হয়েছিল হজরত হুদ আ.-এর জাতি 'কওমে আদ'?!

আল্লাহ তাআলা তাদের উদ্দেশে প্রেরণ করেছিলেন প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু, যা তাদের সমূলে ধ্বংস করেছিল। কখন ঘটেছিল এ ঘটনা?!

পড়ুন, প্রিয় পাঠক, হৃদয় দিয়ে পাঠ করুন—

﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ﴾

যা তার প্রতিপালকের হুকুমে সবকিছু তছনছ করে ফেলবে। মোটকথা, তারা এমন অবস্থায় প্রভাত করল যে, তাদের আবাসস্থল ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। [সুরা আহক্বাফ : ২৫]

সবকিছু তছনছ করে দেওয়া প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হয়েছিল ভোরের সময়। এই মোবারক সময়েই ধ্বংস হয়েছিল জালিমের দল আর অন্যায়ের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেয়েছিল সমকালের ঈমানদার কাফেলা।

হজরত সালিহ আ.-এর জাতি 'কওমে ছামুদ' কীভাবে ধ্বংস হয়েছিল?!

পাঠ করুন, প্রিয় পাঠক, গভীর মনোযোগের সঙ্গে তেলাওয়াত করুন—

﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ۝ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۗ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ﴾

আর যারা জুলুমের পথ অবলম্বন করেছিল, তাদেরকে আঘাত হানল মহা গর্জন। ফলে তারা প্রভাতে তাদের ঘর-বাড়িতে এভাবে অধোমুখে পড়ে থাকল, যেন তারা কখনো সেখানে বসবাসই করেনি। মনে রেখো, ছামুদ জাতি নিজ প্রতিপালকের কুফরি করেছিল। স্মরণ রেখো, ছামুদ জাতিই ধ্বংস হয়েছিল। [সুরা হুদ : ৬৭-৬৮]

স্বয়ং আখেরি নবী মুহাম্মাদে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাতেও তো একই সুন্নাতুল্লাহর বাস্তবায়ন! আল্লাহর সুন্নাত তো চিরন্তন! তাই তো নবীজি বলতেন—

«إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ»

> আমরা যখন কোনো সম্প্রদায়ের আঙিনায় অবতরণ করি, তখন ওই সতর্ককৃতদের প্রভাত হবে কতই না অশুভ![৮৮]

প্রত্যুষের সময়ই হলো পরিবর্তনের সময়, জিহাদ ও সংগ্রামের সময়, পৃথিবীতে ঈমানদারদের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়।

আরও দেখুন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে আল্লাহর রাস্তায় লড়াইকারী অশ্বসমূহের শপথ করতে গিয়ে সেসব অশ্বের শপথ করেছেন, যেগুলো প্রত্যুষে দুশমনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে!

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴾وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۝ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۝ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا﴿

> শপথ সেই ঘোড়াসমূহের, যারা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ায়। তারপর যারা (খুরের আঘাতে) অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎক্ষিপ্ত করে। তারপর প্রভাতকালে আক্রমণ চালায়। [সুরা আদিয়াত : ১-৩]

কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকর থাকবে এই রীতি! এ যে সুন্নাতুল্লাহ! এ তো শাশ্বত রীতি! এতে নেই কোনো পরিবর্তন! নেই কোনো ব্যতিক্রম!

এমনকি পৃথিবীর একেবারে সর্বশেষ সময়ে যে সংস্কার ও পরিবর্তন সংঘটিত হবে, তাতেও তাদেরই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হবে, যারা নিয়মিত ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করবে!

পৃথিবীতে হজরত ঈসা মাসিহ আ.-এর অবতরণ এবং ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হবে ফজরের নামাজের সময়েই!

মাসিহ আ.-কে স্বাগত জানানোর অধিকার তারাই লাভ করবে, যারা নিয়মিত ফজরের নামাজ আদায় করে!

প্রিয় নবীজির নিম্নোক্ত হাদিসটি লক্ষ করুন। হাদিসটিতে নবীজি আগামীর পৃথিবীর অতি গুরুত্বপূর্ণ এক দৃশ্যপট বর্ণনা করেছেন। হজরত আবু উমামা বাহিলি রাযি. বর্ণনা করেন, নবীজি ইরশাদ করেছেন—

---

৮৮. সুনানে নাসায়ী, হাদিস নং ৫৪৭।

«إِنَّهُ لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ مُنْذُ ذَرَأَ اللهُ ذُرِّيَّةَ آدَمَ أَعْظَمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا حَذَّرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ، وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَةَ»

যখন থেকে আল্লাহ তাআলা আদমসন্তানকে সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে দাজ্জালের ফিতনার চাইতে আর কোনো বড় ফিতনা জমিনে সংঘটিত হয়নি। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা এমন কোনো নবী পাঠাননি, যিনি তার উম্মতকে দাজ্জালের বিষয়ে সতর্ক করেননি। আর আমি সর্বশেষ নবী এবং তোমরা সর্বশেষ উম্মত। সে অবশ্যই তোমাদের মাঝে প্রকাশ পাবে।

এরপর নবীজি দাজ্জালের কাঠামো-বিবরণ, দাজ্জালের কর্মকাণ্ড, ইয়াজুজ-মাজুজের আগমন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। তারপর আলোচনা করেন পৃথিবীর একেবারে শেষ মুহূর্ত সম্পর্কে। তিনি আলোচনা করেন সেসব ঈমানদারদের কথা, যাদের মাঝে হজরত ঈসা আ. অবতরণ করবেন শরিয়তে মুহাম্মাদির মাধ্যমে পৃথিবীতে নতুন করে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে। নবীজি ইরশাদ করেন—

«وَجُلُّهُمْ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَإِمَامُهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَبَيْنَمَا إِمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ يُصَلِّي بِهِمُ الصُّبْحَ، إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الصُّبْحَ»

তাদের (অর্থাৎ ঈমানদারদের) অধিকাংশই সে সময় বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করবে। তাদের ইমাম হবেন একজন নেককার ব্যক্তি। এমতাবস্থায় একদিন তাদের ইমাম তাদের নিয়ে ফজরের নামাজ আদায়ে অগ্রসর হবেন। সেই প্রত্যুষকালেই ঈসা বিন মারইয়াম (আসমান হতে) অবতরণ করবেন।

আল্লাহু আকবার! এ তো হঠাৎ বেখেয়ালে বলে ফেলা কোনো কথা নয়! এ তো পরিবর্তনের মুহূর্ত, মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, মর্যাদা ও উন্নতির সময়ের বিবরণ!

রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

«إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الصُّبْحَ، فَرَجَعَ ذٰلِكَ الْإِمَامُ يَنْكُصُ، يَمْشِي الْقَهْقَرٰى لِيَتَقَدَّمَ عِيسٰى يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ، فَيَضَعُ عِيسٰى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: تَقَدَّمْ، فَصَلِّ؛ فَإِنَّهَا لَكَ أُقِيمَتْ، فَيُصَلِّيْ بِهِمْ إِمَامُهُمْ»

প্রত্যুষকালে ঈসা বিন মারইয়াম (আসমান হতে) অবতরণ করবেন। তখন উক্ত ইমাম (তাকে দেখে) পেছন দিকে হাঁটবেন, যাতে ঈসা সামনে অগ্রসর হয়ে লোকদের নামাজে ইমামতি করতে পারেন। ঈসা তার হাত উক্ত ইমামের দু কাঁধের ওপর রাখবেন এবং তাকে বলবেন, আপনি সামনে যান এবং নামাজে ইমামতি করুন। কেননা, এই নামাজ আপনার জন্যই কায়েম করা হয়েছে (অর্থাৎ আপনার ইমামতির নিয়ত করা হয়েছে)। তখন তাদের ইমাম তাদের নিয়ে নামাজ আদায় করবেন![৮৯]

এরপরও কি মসজিদে যখন ফজরের জামাত শুরু হয়, তখন কোনো মুসলমান ঘুমিয়ে থাকতে পারে?!

ফজরের নামাজ তো হলো 'বিজয়-প্রজন্মে'র জন্য মহান আল্লাহ তাআলার এক আসমানি হাদিয়া!

যে ব্যক্তি বাস্তবেই মুসলিম জাতির অবস্থা-পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখে; স্বপ্ন দেখে নতুন এক পরিবর্তিত পৃথিবীর, সে যেন জামাতে নামাজ আদায়ের, বিশেষ করে ফজরের নামাজ জামাতে আদায়ের প্রতি যত্নশীল হয়।

﴿فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ﴾

যে কেউ অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, তার অঙ্গীকার-ভঙ্গের পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে।

[সুরা ফাত্‌হ : ১০]

ভালো করে মনে রাখবেন, মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি মোটেও মুখাপেক্ষী নন; আমরাই তার প্রতি পূর্ণ মুখাপেক্ষী।

আমাদের নেক আমলে আল্লাহ তাআলার কক্ষনো কোনো লাভ হবে না, আমাদের হাজারো গুনাহে আল্লাহ তাআলার সামান্য ক্ষতিও হবে না।

---

৮৯. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং-৪০৭৭।

আমাদের ভালো ও মন্দ আমলের লাভ-ক্ষতি আমাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ।

সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো কল্যাণ লাভ করেছে, সে যেন মহান আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে আর যে ভিন্ন কিছু পেয়েছে, সে যেন ভর্ৎসনা করে নিজেকেই!

আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, আমরা যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত হই, যাদের সম্পর্কে তিনি ইরশাদ করেছেন—

﴿الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَ اُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ﴾

যারা কথা শোনে মনোযোগ দিয়ে, অতঃপর তার মধ্যে যা-কিছু উত্তম, তার অনুসরণ করে, তারাই এমন লোক যাদেরকে আল্লাহ হেদায়েত দান করেছেন এবং তারাই বোধশক্তিসম্পন্ন।

[সুরা যুমার : ১৮]

* * *

এমন একটি দিনের স্বপ্ন দেখি।

আমি সেই দিনটির স্বপ্ন দেখি—

যেদিন মুসলিম জনপদের প্রতিটি মসজিদ মুসল্লিতে পরিপূর্ণ দেখব।

যেদিন উম্মাহর প্রতিটি সদস্য প্রবল আগ্রহ নিয়ে ফজরের আজানের প্রতীক্ষা করবে।

যেদিন সকলে মুয়াজ্জিনের সঙ্গে আজানের কালিমাগুলো পুনরাবৃত্তি করবে; আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হবে সকলের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর—'আসসালাতু খাইরুম মিনান নাওম'! নিদ্রা হতে নামাজ উত্তম।

যেদিন সকলে অস্থিরচিত্তে ছুটে যাবে আল্লাহর ঘরের দিকে। প্রত্যেকের মনেই মাহবুবের সাক্ষাৎলাভের দুর্নিবার আকর্ষণ।

আমি এমন একটি দিনের স্বপ্ন দেখি—

যেদিন একজন মুসলমানেরও মাত্র এক দিনের ফজরের নামাজ ছুটে গেলেও তাকে দেখতে পাব বিষণ্ন ও ব্যথিত; যেন হারিয়ে ফেলেছে বিরাট কিছু, পৃথিবী ও পৃথিবীর মধ্যকার সবকিছুর চেয়েও বড় কিছু।

যেদিন মুসলিম বিশ্বের এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তের সকল দেশের মুসলিম নেতাদের দেখব ফজরের নামাজ ও অন্যান্য নামাজে মসজিদে ইমামতি করছেন।

যেদিন আল্লাহর দ্বীনই হবে পৃথিবীর ধর্ম, আল্লাহ-প্রদত্ত শরিয়তই হবে জগতের একমাত্র শরিয়ত।

যেদিন জুলুম ও অন্যায়ের কাল বিলুপ্ত হবে; ন্যায় ও ইনসাফ, কল্যাণ ও সুবিচার, নুর ও আলোর কাল সূচিত হবে।

আমি এ সবকিছুরই স্বপ্ন দেখি। আমি জানি, আজ আমি যা-কিছুর মাঝে জীবনযাপন করছি, একদিন তাও স্বপ্ন ও কল্পনা ছিল। আমি এও জানি ও বিশ্বাস করি, আজ যা স্বপ্ন ও কল্পনা, আগামী দিন তাই হবে চাক্ষুষ বাস্তব, ইনশাআল্লাহ!

আমি এমন এক ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি, হয়তো আমি তা স্বচক্ষে দেখে যাব! আমার এ স্বপ্ন কোনো ভবিষ্যদ্‌বাণী নয়, নয় অদৃশ্যের অলীক কল্পনা! আমার এ স্বপ্ন আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতির সত্যায়ন! আর আমার আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।

আমাদের রব তার শাশ্বত ও চিরসত্য গ্রন্থে একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অবশ্যই তা বাস্তবে পরিণত হবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

﴿وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ﴾

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে নিজ খলিফা বানাবেন, যেমন খলিফা বানিয়েছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তাদের জন্য তিনি সেই দ্বীনকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠা দান করবেন, যে দ্বীনকে তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তারা যে ভয়-ভীতির মধ্যে আছে, তার পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে। আমার সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক করবে না। এরপরও যারা অকৃতজ্ঞতা করবে, তারাই অবাধ্য সাব্যস্ত হবে। [সুরা নুর : ৫৫]

এর সরাসরি পরবর্তী আয়াতেই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

﴿وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ﴾

আর নামাজ কায়েম করো, জাকাত আদায় করো এবং রাসুলের আনুগত্য করো, যাতে তোমাদের প্রতি রহমতের আচরণ করা হয়। [সুরা নুর : ৫৬]

এটাই হলো পৃথিবীতে বিজয় ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পথ ও পদ্ধতি।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন মুসলিম উম্মাহর জন্য সততা ও ন্যায়ের পথ সহজ করে দেন; যেন নেককারগণ মর্যাদাবান ও সম্মানিত হয়, অবাধ্যরা হীন ও লাঞ্ছিত হয়, জগৎজুড়ে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধাজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়।

মহান আল্লাহ তাআলা-ই সকলের তত্ত্বাবধায়ক, তিনি-ই সবকিছুর ক্ষমতা রাখেন।

﴿فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾

আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তোমরা অচিরেই তা স্মরণ করবে। আমি আমার বিষয় আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা। [সুরা মুমিন : ৪৪]

আল্লাহ তাআলা আপনাকে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন।

আপনাদের ওপর বর্ষিত হোক 'সালাম' ও শান্তি!

[সমাপ্ত]

পরিশিষ্ট-১

প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর পাঠ-উপযুক্ত কিছু নববি দোয়া

١- عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا، وَقَالَ : «اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ».

১. হজরত সাওবান রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাজ শেষ করতেন, তখন তিনবার ইসতেগফার পাঠ করতেন এবং বলতেন—

«اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»

হে আল্লাহ, আপনিই শান্তিময়, আপনার পক্ষ হতেই শান্তি অবতীর্ণ হয়। হে মহিমান্বিত ও মর্যাদাশীল সত্তা! আপনি বরকতময়।[৯০]

٢- عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : أَمْلٰى عَلَيَّ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ فِيْ كِتَابٍ إِلٰى مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ : «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيْكَ لَه، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ».

২. হজরত মুগিরা বিন শো'বা রাযি.-এর কাতিব (লিপিকার) ওয়াররাদ বলেন, মুগিরা রাযি. মুয়াবিয়া রাযি.-এর কাছে প্রেরিত এক পত্রে আমাকে দিয়ে

---

৯০. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-৫৯১।
দোয়াটির অর্থ : হে আল্লাহ, আপনিই শান্তিময়, আপনার পক্ষ হতেই শান্তি অবতীর্ণ হয়। হে মহিমান্বিত ও মর্যাদাশীল সত্তা! আপনি বরকতময়।

লিখিয়েছেন যে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর এই দোয়া পাঠ করতেন—

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»

একক সত্তা আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তার কোনো অংশীদার নেই। রাজত্ব তারই এবং সমস্ত প্রশংসাও তারই। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ, আপনি যা দান করেন, কেউ তা রোধ করতে পারে না এবং আপনি যা রোধ করেন, কেউ তা দান করতে পারে না। আর কোনো সম্পদশালীর সম্পদ আপনার আজাব থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে না।[৭১]

٤-عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «خَصْلَتَانِ لَا يُحْصِيْهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَهُمَا يَسِيْرٌ، وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ، يُسَبِّحُ اللهَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُ عَشْرًا، وَيَحْمَدُ عَشْرًا». -فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ- «فَذٰلِكَ خَمْسُوْنَ وَمِئَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ وَخَمْس مِئَةٍ فِي الْمِيْزَانِ، وَإِذَا أَوٰى إِلَى فِرَاشِهِ، سَبَّحَ، وَحَمِدَ، وَكَبَّرَ مِئَةً، فَتِلْكَ مِئَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ فِي الْمِيْزَانِ، فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَ مِئَةِ سَيِّئَةٍ»؟ قَالُوا : وَكَيْفَ لَا يُحْصِيْهِمَا؟ قَالَ : «يَأْتِيْ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيَقُوْلُ : اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا، حَتَّى يَنْفَكَّ الْعَبْدُ لَا يَعْقِلُ، وَيَأْتِيْهِ وَهُوَ فِيْ مَضْجَعِهِ، فَلَا يَزَالُ يُنَوِّمُهُ حَتَّى يَنَامَ».

৩. হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি কোনো মুসলমান দুটি অভ্যাস ধারণ করতে পারে, সে জান্নাতে যাবে। অভ্যাস-দুটি আয়ত্ত করা সহজ; কিন্তু

---

৭১. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং-৮৪৪ ও *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং-৫৯৩।

এর অনুযায়ী আমলকারী অল্প। প্রত্যেক (ফরজ) নামাজের পর দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আল্লাহু আকবার ও দশবার আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি নবীজিকে এগুলো তার হাতে গণনা করতে দেখেছি। এরপর নবীজি বললেন, তা মুখে পড়া হয় একশ পঞ্চাশবার আর মিজানে তার ওজন হয় এক হাজার পাঁচশ বারের! আর যখন সে শয্যাগ্রহণ করবে, তখন সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার একশবার পাঠ করবে। মুখে হবে একশবার আর মিজানে হবে এক হাজারবারের ওজন! তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যে প্রত্যহ দু হাজার পাঁচশ গুনাহ করবে?! সাহাবায়ে কেরাম (বিস্ময়াভিভূত হয়ে) আরজ করলেন, (এত ফজিলতপূর্ণ) অভ্যাস-দুটি কীভাবে মানুষ আয়ত্ত না করে থাকবে?! নবীজি উত্তর দিলেন, তোমাদের কেউ যখন নামাজে দাঁড়ায়, তখন শয়তান তার কাছে এসে বলে, অমুক অমুক বিষয় স্মরণ করো। একপর্যায়ে বান্দা জিকিরের কথা ভুলে যায়। আর যখন সে বিছানায় যায়, তখনও শয়তান তার কাছে এসে তাকে এমন উদাসীন করে দেয় যে, সে (জিকির না করেই) ঘুমিয়ে পড়ে।[৯২]

٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ أَتَوْا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوْا : ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ. فَقَالَ : «وَمَا ذَاكَ؟». قَالُوْا : يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّيْ، وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ، وَيَتَصَدَّقُوْنَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، وَيُعْتِقُوْنَ وَلَا نُعْتِقُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَفَلَا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُوْنَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُوْنَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ؟ وَلَا يَكُوْنُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ». قَالُوا : بَلٰى، يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ : «تُسَبِّحُوْنَ وَتُكَبِّرُوْنَ وَتَحْمَدُوْنَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ مَرَّةً».

৪. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, দরিদ্র মুহাজিরগণ নবীজির দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করল, 'ধনী লোকেরা তো উচ্চ মর্যাদা ও স্থায়ী নিয়ামত নিয়ে গেল!' নবীজি বললেন, 'কীভাবে?' তারা বলল, 'আমরা যেমন নামাজ আদায় করি, তারাও আদায় করে; আমরা যেমন রোজা রাখি, তারাও রোজা রাখে। অপরদিকে তারা দান-সদকা করে, আমরা করতে পারি না।

তারা (দাস-দাসী) আজাদ করে, আমরা করতে পারি না।' নবীজি বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু (আমল) শিক্ষা দেবো না, যা দ্বারা তোমরা তোমাদের অগ্রগামীদের মর্যাদা লাভ করবে এবং অন্যদের থেকে অগ্রগামী থাকবে? আর তোমাদের অপেক্ষা কেউ শ্রেষ্ঠ হতে পারবে না; অবশ্য যারা তোমাদের মতো আমল করবে, তাদের কথা ভিন্ন।' তারা বলল, 'নিশ্চয়ই, হে আল্লাহর রাসুল।' নবীজি বললেন, 'তোমরা প্রত্যেক (ফরজ) নামাজের পর তেত্রিশবার করে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার পাঠ করবে।'[৯৩]

٥- عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيْبُ قَائِلُهُنَّ - أَوْ فَاعِلُهُنَّ - دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ، ثَلَاثٌ وَثَلَاثُوْنَ تَسْبِيْحَةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُوْنَ تَحْمِيْدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُوْنَ تَكْبِيْرَةً».

৫. হজরত কাব বিন উজরা রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর এমন কিছু জিকির আছে, যা পাঠকারী বা আমলকারী কখনো বঞ্চিত হবে না। তাহলো—সুবহানাল্লাহ তেত্রিশবার, আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশবার ও আল্লাহু আকবার চৌত্রিশবার।[৯৪]

٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِئَةِ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».

৬. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক (ফরজ) নামাজের পর তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ ও তেত্রিশবার আল্লাহু

---

[৯৩]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং-৮৪৩ ও *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং-৫৯৫।

[৯৪]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং-৫৯৬।

একবার পাঠ করবে, এই হলো নিরানব্বই আর একশ পূরণের জন্য পাঠ করবে—

«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ»

একক সত্তা আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তার কোনো অংশীদার নেই। রাজত্ব তারই এবং সমস্ত প্রশংসাও তারই। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

তাহলে তার গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যাবে; যদিও তা সমুদ্রের ফেনার মতো (অধিক) হয়।[৯৫]

٧- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوْتَ».

৭. হজরত আবু উমামা রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে, মৃত্যু ব্যতীত অন্য কিছু তার জান্নাতে প্রবেশে অন্তরায় নয়।[৯৬]

٨- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ : أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ.

৮. হজরত উকবা বিন আমির রাযি. বর্ণনা করেন যে, নবীজি আমাকে প্রত্যেক (ফরজ) নামাজের পর মুআ'ওয়িযাত (সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক ও সুরা নাস) পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৯৭]

٩- عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ يَقُوْلُ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِيْنَ يُسَلِّمُ : «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

---

৯৫. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-৫৯৭।

৯৬. আবুল কাসিম তাবারানি, আলমুজামুল আওসাত, হাদিস নং-৮০৬৮ ও আবু আবদুর রহমান নাসায়ি, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাতি, হাদিস নং-১০০।

৯৭. সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং-১৫২৩।

قَدِيْرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ». وَقَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ».

৯. হজরত আবু যুবায়র রহ. বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযি. প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর সালাম ফিরিয়ে এই দোয়া পাঠ করতেন—

«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ»

একক সত্তা আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তার কোনো অংশীদার নেই। রাজত্ব তারই এবং সমস্ত প্রশংসাও তারই। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কারও কোনো (অন্যায় হতে আত্মরক্ষা করার) সামর্থ্য ও (সৎকাজ সম্পাদনের) শক্তি নেই। আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আমরা একমাত্র তারই ইবাদত করি। যাবতীয় নিয়ামত ও অনুগ্রহ তারই দান। সমস্ত সুন্দরতম প্রশংসা তারই জন্য। আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতা একমাত্র তারই জন্য; যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।

তিনি বলেছেন, নবীজি প্রত্যেক (ফরজ) নামাজের পর উচ্চ আওয়াজে এই দোয়াটি পড়তেন।[৯৮]

* * *

একনজরে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর পঠিত দোয়া ও জিকিরসমূহ

১. তিনবার ইসতেগফার। যেমন:

«أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ»

২. একবার

«اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»

৩. একবার

«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيْكَ لَه، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»

৪. তিনটি কালিমার প্রতিটি দশবার

«سُبْحَانَ اللهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَللهُ أَكْبَرُ»

অথবা প্রত্যেকটি তেত্রিশবার

অথবা সুবহানাল্লাহ তেত্রিশবার, আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশবার ও আল্লাহু আকবার চৌত্রিশবার

অথবা প্রত্যেকটি তেত্রিশবার এবং নিম্নের দোয়া একবার

«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيْكَ لَه، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ»

৫. একবার আয়াতুল কুরসি

﴿اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا

يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ

حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴿

৬. একবার করে তিনটি সুরা: সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক ও সুরা নাস।

৭. একবার নিম্নের দোয়া

لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيْكَ لَه، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَا

حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ

الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ»

* * *

পরিশিষ্ট-২

বিশেষভাবে ফজরের নামাজের পর পাঠ-উপযুক্ত কিছু নববি দোয়া-অজিফা

١- عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُوْلَ: اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ، فَاغْفِرْ لِيْ؛ فَإِنَّه لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ». قَالَ: «وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

১. হজরত শাদ্দাদ বিন আওস রাযি. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সায়্যিদুল ইসতেগফার হলো—

«اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ، فَاغْفِرْ لِيْ؛ فَإِنَّه لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ»

হে আল্লাহ, আপনিই আমার প্রতিপালক। আপনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আপনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন আর আমি আপনারই দাস। আমি যথাসাধ্য আপনার সঙ্গে কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের ওপর আছি। আমি আমার যাবতীয় কৃতকর্মের কুফল হতে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমাকে আপনি যে নিয়ামতরাজি দান করেছেন, আমি তা স্বীকার করছি এবং আমার কৃত গোনাহের কথাও স্বীকার করছি। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। কারণ, আপনি ছাড়া অন্য কেউ গোনাহ মাফ করতে পারে না।

(নবীজি) বলেন, যে ব্যক্তি সকালে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে এই ইসতেগফার পাঠ করবে, আর ওই দিন সন্ধ্যার পূর্বেই মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আর যে ব্যক্তি রাতে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে এই ইসতেগফার পাঠ করবে, আর ওই দিন ভোরের পূর্বেই মারা যাবে, সে-ও অনুরূপ জান্নাতি হবে।[৯৯]

٢- عَنْ جُوَيْرِيَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ؛ وَهِيَ فِيْ مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحٰى، وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ : «مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِيْ فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟» قَالَتْ : نَعَمْ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ».

২. আম্মাজান হজরত জুওয়াইরিয়া রাযি. হতে বর্ণিত, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যুষে ফজরের নামাজের সময় তার নিকট থেকে বের হলেন। জুওয়াইরিয়া তখন তার নামাজের স্থানেই ছিলেন। এরপর নবীজি চাশতের সময়ের পর ফিরে এলেন। তখনও জুওয়াইরিয়া (পূর্বাবস্থায়) বসে ছিলেন। নবীজি বললেন, আমি তোমাকে যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিলাম, এখনও সে অবস্থায়ই আছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। নবীজি বললেন, আমি তোমার নিকট থেকে যাওয়ার পর চারটি কালিমা তিনবার পাঠ করেছি। আজ পর্যন্ত তুমি যা বলেছ, তার সঙ্গে ওজন করলে এই কালিমাগুলোর ওজনই বেশি হবে। কালিমাগুলো হলো—

«سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ»

আমি আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি তার সৃষ্টি পরিমাণ, তার সন্তুষ্টি ও তার আরশের ওজনের পরিমাণ এবং তার কালিমার কালি পরিমাণ।[১০০]

٣- عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسٰى : رَضِيْنَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ».

৩. হজরত সাওবান রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় এই দোয়া পাঠ করবে, তাকে সন্তুষ্ট করা আল্লাহ তাআলার ওপর যেন অবধারিত হয়ে যায় (অর্থাৎ আল্লাহ তার ওপর অবশ্যই সন্তুষ্ট হবেন)। দোয়াটি হলো—

«رَضِيْنَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا»

আমরা আল্লাহকে রব হিসেবে গ্রহণ করে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে এবং মুহাম্মাদকে রাসুল হিসেবে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হয়েছি।[১০১]

٤- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا فِيْ لَيْلَةِ مَطِيْرَةٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيْدَةٍ نَطْلُبُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ لَنَا، قَالَ: فَأَدْرَكْتُهُ، فَقَالَ: «قُلْ». فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا. ثُمَّ قَالَ: «قُلْ». فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا. قَالَ: «قُلْ». فَقُلْتُ: مَا أَقُوْلُ؟ قَالَ: «قُلْ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِيْنَ تُمْسِيْ وَتُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؛ تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ».

৪. হজরত আবদুল্লাহ বিন খুবাইব রাযি. বর্ণনা করেন, এক বর্ষণমুখর রাতে গভীর অন্ধকারে নিজেদের জন্য দোয়া চাওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা নবীজির সন্ধানে বের হলাম। এক স্থানে গিয়ে আমি নবীজিকে পেয়ে গেলাম। তখন তিনি বললেন, বলো। আমি কিছুই বললাম না। নবীজি আবারও বললেন, বলো। আমি কিছুই বললাম না। নবীজি তৃতীয়বার বললেন, বলো। আমি বললাম, (হে আল্লাহর রাসুল,) কী বলব? নবীজি উত্তর দিলেন, তুমি যখন সন্ধ্যায় উপনীত হও এবং যখন প্রত্যুষে উপনীত হও, তখন তিনবার করে সুরা ইখলাস ও মুআওয়িযাতাইন (সুরা ফালাক ও সুরা নাস) পাঠ করবে। তাহলে তা সবকিছুর ক্ষেত্রে তোমার জন্য জন্য যথেষ্ট হবে।[১০২]

٥- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي

---

১০১. সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং-৫০৭২, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং-৭৮৭০ ও জামে তিরমিজি, হাদিস নং-৩৩৮৯ ।

১০২. সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং-৫০৮২ ও জামে তিরমিজি, হাদিস নং-৩৫৭৫ ।

السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُمْسِيَ».

৫. হজরত উসমান বিন আফফান রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এই দোয়াটি তিনবার পাঠ করবে, সে সকাল পর্যন্ত কোনো আকস্মিক বিপদের শিকার হবে না। আর যে সকালে তা তিনবার পাঠ করবে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো আকস্মিক বিপদের শিকার হবে না। দোয়াটি হলো—

«بِاسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ»

আল্লাহর নামে শুরু করছি, যার নামের বরকতে জমিন-আসমানের কোনো কিছুই ক্ষতিসাধন করতে পারে না। তিনি-ই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।(১০৩)

٦- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، يُقَالُ لَه أَبُوْ أُمَامَةَ، فَقَالَ: «يَا أَبَا أُمَامَةَ! مَا لِيْ أَرَاكَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فِيْ غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟». قَالَ: هُمُوْمٌ لَزِمَتْنِيْ وَدُيُوْنٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: «أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلَامًا إِذَا أَنْتَ قُلْتَه أَذْهَبَ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّكَ، وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ؟»، قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: «قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ».

قَالَ: فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ، فَأَذْهَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمِّيْ، وَقَضَى عَنِّيْ دَيْنِيْ.

৬. হজরত আবু সাইদ খুদরি রাযি. বর্ণনা করেন, একদা নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে আবু উমামা নামক জনৈক আনসারি সাহাবিকে দেখতে পেলেন। নবীজি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আবু উমামা, তোমাকে নামাজের সময় ব্যতীত মসজিদে উপবিষ্ট দেখছি যে?!' আবু

---

১০৩. সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং-৫০৮৮ ও জামে তিরমিজি, হাদিস নং-৩৩৮৮।

উমামা উত্তর দিলেন, 'আল্লাহর রাসুল, সীমাহীন দুশ্চিন্তা ও ঋণভারে জর্জরিত হওয়ায় (এ সময় মসজিদে উপস্থিত হয়েছি)।' নবীজি বললেন, 'আমি কি তোমাকে এমন এক দোয়া-বাক্য শিক্ষা দেবো না, যা পাঠ করলে আল্লাহ তোমার দুশ্চিন্তা দূরীভূত করবেন এবং তোমার কর্জ পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন?' 'অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসুল।' আবু উমামা উত্তর দিলেন। নবীজি বললেন, তুমি সকাল-সন্ধ্যায় এরূপ বলবে,

«اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ»

হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই আমি আপনার আশ্রয় কামনা করছি চিন্তা-দুশ্চিন্তা হতে, আপনার আশ্রয় কামনা করছি অক্ষমতা ও অলসতা হতে, আপনার আশ্রয় কামনা করছি ভীরুতা ও কৃপণতা হতে এবং আপনার আশ্রয় কামনা করছি ঋণভার ও মানুষের দুষ্ট প্রভাব হতে।

আবু উমামা বলেন, অতঃপর আমি এরূপ আমল করি। এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তাআলা আমার যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা বিদূরিত করেন এবং ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন।[১০৪]

٧- عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيْمِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَرَّ إِلَيْهِ، فَقَالَ : «إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْ : اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ؛ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذٰلِكَ ثُمَّ مِتَّ فِيْ لَيْلَتِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا، وَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ كَذٰلِكَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ فِيْ يَوْمِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا».

৭. হজরত মুসলিম বিন হারিস তামিমি রাযি. বর্ণনা করেন, একদা নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিভৃতে বলেন যে, যখন তুমি মাগরিবের নামাজ শেষ করবে, তখন সাতবার এই দোয়া পড়বে—

«اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ»

হে আল্লাহ, আমাকে জাহান্নাম হতে নাজাত দান করুন।

---

১০৪ সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং-১৫৫৫।

কেননা, সন্ধ্যায় যদি তুমি এ দোয়া পাঠ কর আর সে রাতে মারা যাও, তাহলে তুমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। আর ফজরের নামাজ আদায়ের পর যদি তুমি এরূপ বলো, আর তুমি সেদিন মারা যাও, তবে তুমি জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি পাবে।[১০৫]

৮- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ أَوْ يُمْسِيْ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ أَعْتَقَ اللهُ رُبُعَه مِنَ النَّارِ، فَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ اللهُ نِصْفَه، وَمَنْ قَالَهَا ثَلَاثًا أَعْتَقَ اللهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِه، فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعًا أَعْتَقَهُ اللهُ مِنَ النَّارِ».

৮. হজরত আনাস রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যুষে বা সন্ধ্যায় এই দোয়াটি পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তাকে জাহান্নামের এক-চতুর্থাংশ আজাব থেকে নাজাত দান করবেন। যে দুবার পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তাকে অর্ধেক আজাব থেকে মুক্তি দান করবেন। যে তিনবার পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তাকে তিন-চতুর্থাংশ আজাব হতে মুক্তি দান করবেন। আর যদি চারবার পাঠ করে, আল্লাহ তাকে জাহান্নাম হতে পূর্ণ নিষ্কৃতি দান করবেন। দোয়াটি হলো—

«اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ»

হে আল্লাহ, আমি প্রভাতে উপনীত হয়েছি। আমি আপনাকে, আপনার আরশবাহী ফিরেশতাগণকে, আপনার সকল ফিরেশতাদেরকে এবং আপনার সমস্ত সৃষ্টিকে এ বিষয়ে সাক্ষী রাখছি যে, আপনিই আল্লাহ এবং আপনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই আর মুহাম্মাদ আপনার বান্দা ও রাসুল।[১০৬]

---

১০৫. সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং-৫০৭৯।

٩- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَنَّامٍ الْبَيَاضِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ: اَللّٰهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ، وَلَكَ الشُّكْرُ، فَقَدْ أَدّٰى شُكْرَ يَوْمِهِ، وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ حِيْنَ يُمْسِيْ فَقَدْ أَدّٰى شُكْرَ لَيْلَتِهِ».

৯. হজরত আবদুল্লাহ বিন গান্নাম বাইয়াযি রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যুষে এই দোয়াটি পাঠ করবে, সে যেন পুরো দিবসের শোকর আদায় করল। আর যে সন্ধ্যায় অনুরূপ পাঠ করবে, সে যেন পুরো রাতের শোকর আদায় করল। দোয়াটি হলো—

«اَللّٰهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ، وَلَكَ الشُّكْرُ»

সকালে আমার কাছে যে নিয়ামত আছে, তা একমাত্র আপনিই দান করেছেন। আপনার কোনো অংশীদার নেই। সমস্ত প্রশংসা ও শোকর আপনারই।[১০৭]

١٠- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ أَنَّه قَالَ لِأَبِيْهِ: يَا أَبَتِ! إِنِّيْ أَسْمَعُكَ تَدْعُوْ كُلَّ غَدَاةٍ: «اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، تُعِيْدُهَا ثَلَاثًا حِيْنَ تُصْبِحُ، وَثَلَاثًا حِيْنَ تُمْسِيْ»؟! فَقَالَ: إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ بِهِنَّ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنَّ بِسُنَّتِه.

১০. হজরত আবদুর রহমান বিন আবু বাকরা হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতা (আবু বাকরা রাযি.)-কে বললেন, হে আমার পিতা! আমি আপনাকে প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় এ দোয়াটি তিনবার পাঠ করতে শুনি। (এর কারণ কী?) তিনি বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ পাঠ করতে শুনেছি। আর আমি তার সুন্নাতের অনুসরণ করতে পছন্দ করি। দোয়াটি হলো,

১০৭. সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং-৫০৭৩।

«اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ»

হে আল্লাহ, আমার দেহকে রোগমুক্ত রাখুন। হে আল্লাহ, আমার কানকে রোগমুক্ত রাখুন। হে আল্লাহ, আমার দৃষ্টিকে রোগমুক্ত রাখুন। আপনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই।(১০৮)

٥٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ : ﴿فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ۝ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ﴾ إِلَى ﴿وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ﴾ ۝ أَدْرَكَ مَا فَاتَه فِيْ يَوْمِه ذٰلِكَ، وَمَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يُمْسِيْ أَدْرَكَ مَا فَاتَه فِيْ لَيْلَتِه».

১১. হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সকালে নিম্নের আয়াতগুলো পাঠ করবে, সে ব্যক্তি সেদিনের সকল ছুটে যাওয়া (অজিফার) সাওয়াব লাভ করবে। আর যে সন্ধ্যায় পাঠ করবে, সে রাতের সকল ছুটে যাওয়া (অজিফার) সাওয়াব লাভ করবে। আয়াতগুলো হলো—

﴿فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ۝ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ۝ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ﴾

সুতরাং আল্লাহর তাসবিহতে নিমগ্ন থাকো যখন তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হও তখনও এবং যখন তোমরা ভোরে উপনীত হও তখনও। এবং তারই প্রশংসা করা হয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এবং বিকেল বেলায় (তার তাসবিহতে নিমগ্ন থাকো) এবং জোহরের সময়ও। তিনি প্রাণহীন হতে প্রাণসম্পন্নকে বের করে আনেন এবং প্রাণবান হতে প্রাণহীনকে বের করে আনেন। আর তিনি ভূমিকে তার মৃত্যুর পর

সঞ্জীবিত করেন। এভাবেই তোমাদেরকে (কবর থেকে) বের করা হবে।[১০৯] [সুরা রূম : ১৭-১৯]

১২- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُ هٰؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ حِيْنَ يُمْسِيْ وَحِيْنَ يُصْبِحُ : «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِيْ، وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ، وَاحْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِيْ، وَعَنْ يَمِيْنِيْ، وَعَنْ شِمَالِيْ، وَمِنْ فَوْقِيْ، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ».

১২. হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীজি সন্ধ্যায় ও সকালে এই দোয়াগুলো কখনও ছাড়তেন না—

«اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِيْ، وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِيْ، وَعَنْ يَمِيْنِيْ، وَعَنْ شِمَالِيْ، وَمِنْ فَوْقِيْ، وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ»

হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতে সুস্থতা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আমার দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষমা ও কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং আমার পরিজন ও সম্পদের জন্য ক্ষমা ও কল্যাণ প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ, আমার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখুন। আমার অন্তরে শান্তি দান করুন। আমাকে রক্ষা করুন আমার সামনের দিক হতে, পেছনের দিক হতে, ডান দিক, বাম দিক ও ওপরের দিক হতে। আমি আপনার মহত্ত্বের আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার নিচে ধসে যাওয়া হতে।[১১০]

ى- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِيْنَ يُسَلِّمُ : «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا».

১৩. আম্মাজান উম্মে সালামা রাযি. হতে বর্ণিত, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাজ পড়ে সালাম ফিরিয়ে এই দোয়াটি পাঠ করতেন—

«اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا»

হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে কল্যাণকর ইলম, উত্তম রিজিক ও মাকবুল আমল প্রার্থনা করছি।[১১১]

ى- عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، وَقَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْحَشْرِ وَكَّلَ اللهُ بِه سَبْعِيْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ حَتّٰى يُمْسِيَ، وَإِنْ مَاتَ فِيْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيْدًا، وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِيْ كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ».

১৪. হজরত মাকিল বিন ইয়াসার রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যুষে তিনবার পাঠ করবে— أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ এবং সুরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ তার জন্য সত্তর হাজার ফিরেশতা নিযুক্ত করে দেবেন, যারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য দোয়া করবে। সে যদি সেদিন মারা যায় তাহলে শহিদি মৃত্যু লাভ করবে। আর যে সন্ধ্যায় পাঠ করবে, সেও একই মর্যাদা লাভ করবে।[১১২]

ى- عَنْ أَبِيْ رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيِّ قَالَ : أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، فَقُلْتُ لَه : حَدِّثْنَا مِمَّا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

---

১১১. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং-৯২৫।
১১২. জামে তিরমিজি, হাদিস নং-২৯২২।

وَسَلَّمَ. فَأَلْقَى إِلَيَّ صَحِيفَةً، فَقَالَ : هٰذَا مَا كَتَبَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ : فَنَظَرْتُ فِيْهَا، فَإِذَا فِيْهَا : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! عَلِّمْنِيْ مَا أَقُوْلُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ. فَقَالَ : «يَا أَبَا بَكْرٍ قُلْ : اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَه، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِه، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلٰى نَفْسِيْ سُوْءًا أَوْ أَجُرَّه إِلٰى مُسْلِمٍ».

১৫. (তাবেয়ি) আবু রাশিদ হুবরানি রহ. বর্ণনা করেন, আমি একদা হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আছ রাযি.-এর কাছে উপস্থিতি হয়ে তাকে বললাম, আমাদেরকে নবীজির জবান থেকে শ্রুত কোনো হাদিস বর্ণনা করুন। তখন তিনি আমার দিকে একটি পাণ্ডুলিপি এগিয়ে দিয়ে বললেন, এই হলো তা, যা নবীজি আমাকে লিখিয়ে দিয়েছেন। আমি পাণ্ডুলিপিটিতে লেখা দেখতে পেলাম যে, আবু বকর সিদ্দিক নবীজিকে বলেছেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে এমন দোয়া শিক্ষা দিন, যা আমি সকালে-সন্ধ্যায় পাঠ করব। নবীজি বললেন, হে আবু বকর, তুমি এই দোয়াটি পড়বে—

«اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَه، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِه، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلٰى نَفْسِيْ سُوْءًا أَوْ أَجُرَّه إِلٰى مُسْلِمٍ»

হে আল্লাহ, আসমান-জমিনের স্রষ্টা! দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী! আপনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। প্রতিটি বস্তুর রব ও মালিক! আমি আপনার কাছে পানাহ চাই আমার নফসের অনিষ্ট হতে, শয়তানের অনিষ্ট ও শিরক হতে, আমার বিষয়ে অকল্যাণকর কোনো কিছু করা হতে বা অন্য কোনো মুসলমানের ক্ষতি করা হতে।[১১৩]

١٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ قَرَأَ حٰم الْمُؤْمِنَ إِلَى ﴿إِلَيْهِ الْمَصِيْرُ﴾ وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ حِيْنَ يُصْبِحُ حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُمْسِيَ، وَمَنْ قَرَأَهُمَا حِيْنَ يُمْسِيْ حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُصْبِحَ».

১৬. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সকালে সুরা হা-মিম إِلَيْهِ الْمَصِيْرُ পর্যন্ত ও আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে, সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে হেফাজত করা হবে। আর যে সন্ধ্যায় পাঠ করবে, সকাল পর্যন্ত তাকে হেফাজত করা হবে।(১১৪)

١٧- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ أَصْحَابَه يَقُوْلُ : «إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوْتُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ. وَإِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوْتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ».

১৭. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে শিক্ষা দিতে গিয়ে বলতেন, তোমাদের কেউ যখন প্রত্যুষে উপনীত হয়, সে যেন এই দোয়া পাঠ করে—

«اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوْتُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ»

হে আল্লাহ, আপনারই অনুগ্রহে আমরা সকাল করেছি, আপনারই অনুগ্রহে আমরা সন্ধ্যা করেছি। আপনারই কর্তৃত্বে আমাদের জীবন, আপনারই কর্তৃত্বে আমাদের মরণ। আপনারই কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন।

আর যখন সন্ধ্যায় উপনীত হয়, তখন যেন এই দোয়া পাঠ করে—

«اَللّٰهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوْتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ»

হে আল্লাহ, আপনারই অনুগ্রহে আমরা সন্ধ্যা করেছি, আপনারই অনুগ্রহে আমরা সকাল করেছি। আপনারই কর্তৃত্বে আমাদের জীবন, আপনারই কর্তৃত্বে আমাদের মরণ। আপনারই দিকে আমাদের উত্থান।[১১৫]

ؤى- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ : «مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَسْمَعِيْ مَا أُوْصِيكِ بِهِ أَنْ تَقُوْلِيْ إِذَا أَصْبَحْتِ وَأَمْسَيْتِ : يَا حَيُّ! يَا قَيُّوْمُ! بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ، أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّه، وَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ».

১৮. হজরত আনাস রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রাযি. কে বলেন, আমি তোমাকে যা অসিয়ত করছি, তা শুনতে কিসে তোমাকে বাধা দিচ্ছে?! তুমি যখন প্রভাতে ও সন্ধ্যায় উপনীত হবে, তখন এই দোয়াটি পাঠ করবে—

«يَا حَيُّ! يَا قَيُّوْمُ! بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ، أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّه، وَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ»

হে চিরঞ্জীব, হে অবিনশ্বর, আপনার রহমতের কাছেই আমি সাহায্য প্রার্থনা করছি। আপনি আমার সকল বিষয় সংশোধন করে দিন। আর চোখের পলক পরিমাণ সময়ের জন্যও আমার দায়িত্ব আমার হাতে ছেড়ে দেবেন না।[১১৬]

ؤى- عَنْ طَلْقٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، فَقَالَ : يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ! احْتَرَقَ بَيْتُكَ. قَالَ : مَا احْتَرَقَ. ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ. فَقَالَ : مَا احْتَرَقَ. ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ. فَقَالَ : مَا احْتَرَقَ. ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ : يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ! انْبَعَثَتِ النَّارُ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَى بَيْتِكَ طَفِئَتْ. قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَكُنْ لِيَفْعَلَ. قَالَ : يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ! مَا نَدْرِيْ أَيُّ كَلَامِكَ أَعْجَبُ، قَوْلُكَ : مَا

اِحْتَرَقَ أَوْ قَوْلُكَ : قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيَفْعَلَ ذَاكَ؟! قَالَ : ذَاكَ لِكَلِمَاتٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يُصْبِحُ لَنْ تُصِيْبَهُ مُصِيْبَةٌ حَتَّى يُمْسِيَ : «اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، إِنَّ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ».

১৯. হজরত তল্‌ক রহ. হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি আবু দারদা রাযি.-এর কাছে এসে বলল, 'আবু দারদা, আপনার বাড়ি পুড়ে গেছে।' তিনি বললেন, 'না পুড়েনি।' এভাবে একে একে তিনজন একই সংবাদ দিল আর তিনি প্রত্যেককেই উত্তর দিলেন, 'না, পুড়েনি।' কিছুক্ষণ পর আরেকজন ব্যক্তি এসে বলল, 'আবু দারদা, আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। অবশেষে আপনার বাড়ির কাছে এসে নিভে গেছে।' তিনি বললেন, 'আমি জানি যে, আল্লাহ তাআলা এরূপ করবেন না।' লোকটি বলল, 'হে আবু দারদা, আমরা বুঝতে পারছি না যে, আপনার কোনো কথাটি বেশি বিস্ময়কর—'না পুড়েনি', না-কি 'আমি জানি যে, আল্লাহ তাআলা এরূপ করবেন না।'?! আবু দারদা রাযি. বললেন, আমি নবীজিকে এমন কিছু কালিমা বলতে শুনেছি, যে তা সকালে পাঠ করবে, সন্ধ্যা পর্যন্ত তার কোনো বিপদ হবে না। দোয়াটি হলো—

«اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، إِنَّ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ»

হে আল্লাহ, আপনিই আমার রব। আপনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আমি আপনারই ওপর ভরসা করি। আপনি মহান আরশের অধিপতি। আল্লাহ যা চান, তা-ই হয়; তিনি যা চান না, তা হয় না। মহত্তম ও মহামহিম সত্তা আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কারও কোনো (অন্যায় হতে আত্মরক্ষা করার) সামর্থ্য

ও (সৎকাজ সম্পাদনের) শক্তি নেই। আমি জানি যে, আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান এবং সবকিছু আল্লাহর জ্ঞানের পরিবেষ্টিত। হে আল্লাহ, আমি আপনার পানাহ কামনা করছি আমার নফসের অনিষ্ট হতে, ভূমিতে বিচরণকারী সকল প্রাণীর অনিষ্ট হতে; সকল প্রাণীর নিয়ন্ত্রণ তো আপনারই হাতে। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সরল পথে রয়েছেন।[১১৭]

ى- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَه : «إِنَّكَ إِنْ قُلْتَ ثَلَاثًا حِيْنَ تُمْسِيْ : أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ،كُلُّه لِلّٰهِ، أَعُوْذُ بِاللهِ الَّذِيْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِه مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِه، حُفِظْتَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَكَاهِنٍ وَسَاحِرٍ حَتّٰى تُصْبِحَ، وَإِنْ قُلْتَهَا - يَعْنِي حِيْنَ تُصْبِحُ - حُفِظْتَ كَذٰلِكَ حَتّٰى تُمْسِيَ».

২০. হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আছ রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন, তুমি যদি সন্ধ্যায় এই দোয়াটি তিনবার পাঠ কর, তাহলে সকাল পর্যন্ত সকল শয়তান, গণক ও জাদুকর থেকে নিরাপদ থাকবে। আর সকালে পাঠ করলে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে। দোয়াটি হলো—

«أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ،كُلُّه لِلّٰهِ، أَعُوْذُ بِاللهِ الَّذِيْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِه مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِه»

আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি (বা সকালে উপনীত হয়েছি) এবং আল্লাহর রাজত্ব সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছে (বা সকালে উপনীত হয়েছে)। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, সকলে আল্লাহর জন্য। আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন, যা ছড়িয়ে দিয়েছেন, তার অনিষ্টতা হতে এবং শয়তানের অনিষ্টতা ও তার শিরক হতে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা

করছি, যিনি আসমানকে তার অনুমতি ব্যতীত জমিনে পতিত হওয়া থেকে ধরে রেখেছেন।(১১৮)

٢١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِيْ : أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّه شَيْءٌ».

২১. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় উপনীত হলে এই দোয়া পাঠ করবে, কোনো কিছু তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। দোয়াটি হলো—

«أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ»

আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করছি তার সৃষ্টির অনিষ্টতা হতে।(১১৯)

٢٢- عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ : أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا، وَمِنْ أَبِيْ بَكْرٍ مِرَارًا، وَمِنْ عُمَرَ مِرَارًا؟ قُلْتُ : بَلَى. قَالَ : «مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى : اَللّٰهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ، وَأَنْتَ تَهْدِيْنِيْ، وَأَنْتَ تُطْعِمُنِيْ، وَأَنْتَ تَسْقِيْنِيْ، وَأَنْتَ تُمِيْتُنِيْ، وَأَنْتَ تُحْيِيْنِيْ؛ لَمْ يَسْأَلْ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ».

২২. হজরত হাসান বর্ণনা করেন, (সাহাবি) সামুরা বিন জুনদুব রাযি. (আমাকে) বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি হাদিস শোনাব না, যা আমি নবীজির কাছ থেকে অনেকবার শুনেছি, আবু বকর থেকে অনেকবার শুনেছি এবং উমর থেকেও অনেকবার শুনেছি। আমি বললাম, অবশ্যই। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় এই দোয়াটি পাঠ করবে, সে যা-ই চাইবে, আল্লাহ তাকে তা-ই দান করবেন। দোয়াটি হলো—

---

১১৮. আবু বকর ইবনুস সুন্নি, *আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাতি*, হাদিস নং-৬৭ ও আবুল কাসিম তাবারানি, *আলমুজামুল আওসাত*, হাদিস নং-৪২৯১।

১১৯. আবুল কাসিম তাবারানি, *আলমুজামুল আওসাত*, হাদিস নং-৫২৩।

«اَللّٰهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ، وَأَنْتَ تَهْدِيْنِيْ، وَأَنْتَ تُطْعِمُنِيْ، وَأَنْتَ تَسْقِيْنِيْ، وَأَنْتَ تُمِيْتُنِيْ، وَأَنْتَ تُحْيِيْنِيْ»

হে আল্লাহ, আপনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আপনিই আমাকে হেদায়েত দান করেন, আপনিই আমাকে আহার দান করেন, আপনিই আমাকে পানীয় প্রদান করেন। আপনিই আমাকে মৃত্যু দান করবেন, আপনিই আমাকে জীবন দান করেন।(১২০)

২- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ : اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَصْبَحْتُ مِنْكَ فِيْ نِعْمَةٍ وَعَافِيَةٍ وَسِتْرٍ، فَأَتِمَّ عَلَيَّ نِعْمَتَكَ وَعَافِيَتَكَ وَسِتْرَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسٰى، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُتِمَّ عَلَيْهِ نِعْمَتَه».

২৩. হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় এই দোয়াটি তিনবার পাঠ করবে, তার প্রতি আপন নিয়ামতকে পূর্ণ করা আল্লাহ তাআলা নিজের জন্য অবধারিত করে নেবেন। দোয়াটি হলো—

«اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَصْبَحْتُ مِنْكَ فِيْ نِعْمَةٍ وَعَافِيَةٍ وَسِتْرٍ، فَأَتِمَّ عَلَيَّ نِعْمَتَكَ وَعَافِيَتَكَ وَسِتْرَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»

হে আল্লাহ, আমি প্রত্যুষে উপনীত হয়েছি আপনার নিয়ামত, সুস্থতা ও নিরাপত্তা-আচ্ছাদনের মাঝে। সুতরাং দুনিয়া ও আখিরাতে আমার জন্য আপনার নিয়ামত, সুস্থতা ও নিরাপত্তা-আচ্ছাদনকে পরিপূর্ণ করে দিন।(১২১)

* * *

একনজরে বিশেষভাবে ফজরের নামাজের পর পাঠ-উপযুক্ত দোয়া ও জিকিরসমূহ

১. একবার সাইয়্যেদুল ইসতেগফার

«اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ»

২. তিনবার «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ»

৩. একবার «رَضِيْنَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا»

৪. তিনবার সুরা ইখলাস ও মুআওয়িযাতাইন (সুরা ফালাক ও সুরা নাস)।

৫. তিনবার

«بِاسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ»

৬. একবার

«اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ»

৭. সাতবার «اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ»

৮. চারবার

«اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ»

৯. একবার

«اَللّٰهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ، وَلَكَ الشُّكْرُ»

১০. তিনবার

«اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ»

১১. একবার সূরা রূম-এর ১৭-১৯ নং আয়াত

﴿فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَ حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ۝ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ عَشِيًّا وَّ حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ۝ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ﴾

১২. একবার

«اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِيْ، وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ، وَاحْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِيْ، وَعَنْ يَمِيْنِيْ، وَعَنْ شِمَالِيْ، وَمِنْ فَوْقِيْ، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ»

১৩. একবার «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا»

১৪. তিনবার «أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ»

এরপর একবার সূরা হাশর-এর শেষ তিন আয়াত

﴿هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ﴾

১৫. একবার

«اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلٰى نَفْسِيْ سُوْءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلٰى مُسْلِمٍ»

১৬. একবার সুরা হা-মিম এর প্রথম তিন আয়াত

﴿حٰمٓ ۝ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝ غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ
شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ﴾

১৭. একবার আয়াতুল কুরসি

﴿اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا
فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ مَا
خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ﴾

১৮. একবার

«اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوْتُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ»

১৯. একবার

«يَا حَيُّ! يَا قَيُّوْمُ! بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ، أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّه، وَلَا تَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ
عَيْنٍ»

২০. একবার দোয়ায়ে আবু দারদা

«اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ، مَا شَاءَ
اللهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، إِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ»

২১. তিনবার

«أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، كُلُّه لِلّٰهِ، أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الَّذِيْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِه مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِه»

২২. একবার «أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ»

২৩. একবার

«اَللّٰهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ، وَأَنْتَ تَهْدِيْنِيْ، وَأَنْتَ تُطْعِمُنِيْ، وَأَنْتَ تَسْقِيْنِيْ، وَأَنْتَ تُمِيْتُنِيْ، وَأَنْتَ تُحْيِيْنِيْ»

২৪. তিনবার

«اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَصْبَحْتُ مِنْكَ فِيْ نِعْمَةٍ وَعَافِيَةٍ وَسِتْرٍ، فَأَتِمَّ عَلَيَّ نِعْمَتَكَ وَعَافِيَتَكَ وَسِتْرَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»

* * *